আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ

NICON

বিসমিহি তায়ালা

নসাইবা

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ

নিয়ন পাবলিকেশন

মুখবন্ধ

সময়ের পরিক্রমায় চলে আসছে সত্য-মিথ্যার লড়াই। অসমাপ্তির এই লড়াইয়ে 'সত্য' সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও—পরক্ষণেই মিথ্যাকে লাঞ্ছিত এবং অপদস্থ করেছে। মিথ্যা কখনোই টিকে থাকতে পারেনি সর্বময়। ধসে পড়েছে ঠুনকো দেয়ালের মতো।

তবুও থেমে থাকেনি সত্য-মিথ্যার এই আক্রমণাত্মক পথচলা। কখনো থামারও নয়। এই পথচলা সমাপ্ত হবে সেদিন—মহান রব যেদিন রায় ঘোষণা করবেন। মিথ্যা-অন্যায়, শাস্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। সত্য-ন্যায়, পরম শান্তিতে নিজ প্রাসাদে অবস্থান নেবে।

সময়ে সময়ে চলে আসা মিথ্যার ঝঞ্ঝাটের একটি 'নারীবাদ'। খালি চোখে খানিকটা বিজয়ী মনে হলেও—পরক্ষণেই তার পরাজয়টা সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। দেখতে পারা যায়, সত্যের বিজয়চিহ্ন। তারই ধারাবাহিকতায় নুসাইবা।

দীর্ঘদিনের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব নিয়েছেন 'নিয়ন পাবলিকেশন'। দায়িত্ব নিয়ে সম্পাদনা করেছেন প্রিয় উস্তাদ মুফতি উবায়দুল হক খান সাহেব হাফি.। কিছু ভুল; চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন হিউম্যান বিয়িং প্রণেতা ইকতেখার সিফাত হাফি. এবং বিশিষ্ট কলামিস্ট আসিফ মাহমুদ হাফি.।

সার্বিকভাবে চেষ্টা করেছি নির্ভুল রাখার। কিন্তু বান্দার কোনো কাজই তো 'লা রইবা' নয়। ভুলগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এর মধ্যে ভালো যা আছে—আল্লাহর পক্ষ থেকে। ভুলগুলো বান্দার পক্ষ থেকে, নিতান্তই অপারগতা হিসেবে। আল্লাহ তাআলা ভুলগুলো ক্ষমা করুন, এবং উপকারী অংশকে কবুল করুন!

বিনীত
আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ

সম্পাদকের কলম থেকে

হক-বাতিলের লড়াই চিরন্তন। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ চলে আসছে যুগ-যুগান্তর। আলো-আঁধারির খেলা চলছে কাল-কালান্তর। সত্যের আলো ফুটে উঠামাত্রই মিথ্যার আঁধার পালাবে এটাই স্বাভাবিক। সত্য-সুন্দরের আলো সহ্য করতে পারে না মিথ্যা-অসুন্দরের কালো।

ইসলাম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন চিরস্থায়ী নাজাত ও মুক্তি, কল্যাণ ও সফলতার দিকনির্দেশনা দিয়েছে। সে কল্যাণ ও সফলতার সবক হাসিলের জন্য যেতে হবে কুরআন-হাদিসের কাছে। কুরআন-হাদিসকে নিজের যুক্তির চোখ দিয়ে দেখলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই শতভাগ। তাকে দেখতে হবে বিশ্বাসের চোখ দিয়ে।

বিশ্বাসী চোখ সবাই অর্জন করতে পারে না। খুব কম মানুষের চোখই বিশ্বাসী হতে পেরেছে। যারা তাদের দুটি চোখকে বিশ্বাসী করতে পারে তারাই সফলতা অর্জন করে। এমন বিশ্বাসী চোখের অধিকারী ছিল নুসাইবা। চলুন নুসাইবাতে প্রবেশ করি...।

আমার ছাত্রদের মধ্যে যারা ভালো লিখছে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ তাদের অন্যতম। তার পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়েছি। কয়েকটি জায়গায় সংশোধন করে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শও দিয়েছি। আশা করি জাতীকে সে ভালো কিছু উপহার দেবে। সে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। আল্লাহ কবুল করুন!

উবায়দুল হক খান
১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঈ.

মূল্যায়ন

আমাদের যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রচারণার যুগ। আমাদের চিন্তায়, মননে, গ্রহণে ও বর্জনে প্রচারণার অনেক বড় একটি প্রভাব আছে। আর আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রচারণায় পশ্চিমা কিংবা ইসলামবিদ্বেষীদের আধিপত্যই বেশি। ফলে নারীসংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলতে এই প্রচারণা অত্যন্ত বেশি প্রভাব ফেলেছে।

আমরা নারীর সেই রূপকে এখন ঘৃণা করতে শিখছি যেই রূপ মহান আল্লাহ তাআলা তাকে নেয়ামত হিসেবে দিয়েছেন। আমাদের কাছে পশ্চিমা সভ্যতার নারী রূপটাকেই এখন সফল ও উন্নত মনে হচ্ছে। চাই সে রূপটা নারীর নারীত্বের ওপর যত অবিচার ও শোষণই চালাক না কেন। নারী সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলাম না নারীর নারীত্বের উপর শোষণ করেছে, আবার না নারীর দায়িত্ব ও অধিকারের ব্যাপারে অবিচার করেছে। বরং ইসলাম নারীর স্বভাবজাত প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল এক রূপরেখা দান করেছে।

কিন্তু পশ্চিমা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের নারীসমাজ আজকে নিজেদের স্বভাবজাত প্রকৃতিবিরোধী এক চিন্তা-চেতনা লালন করতে শুরু করেছে। যা তাদেরকে স্বাধীনতার নামে পরাধীনতায়, উন্নতির নামে অবক্ষয় ও সমতার নামে নিজের উপর অবিচার করার মত জঘন্য সব পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে এসব প্রচারণা তাদের সামনে নারী সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে জুলুম ও অবিচার হিসেবে উপস্থাপন করছে।

বক্ষমান বইটিতে নারী সংক্রান্ত ইসলামের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন লেখক, গল্পের আকারে। যে গল্পে নুসাইবা নামক একজন মেয়েকে প্রধান চরিত্রে রাখা হয়েছে। বইটি আমি কেবল সাধারণ চোখে খুব দ্রুত পড়ে দিয়েছি। এরই মধ্যে বেশকিছু সমস্যা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, যা লেখক দূর করেছেন।

গল্পের জগতে আমাদের ইসলামী সাহিত্যের এখনো বড় একটি শূণ্যতা রয়ে গেছে। অথচ গল্প মানুষ এবং বিশেষত নারী মনে খুব প্রভাব বিস্তারকারী একটি বিষয়। সবমিলিয়ে আশা করি, বইটি সাধারণ ও প্রাথমিক পাঠকদের জন্য খুবই উপকারী এবং প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে ভূমিকা রাখবে। মহান আল্লাহ তাআলা ভুলত্রুটি ক্ষমা করে নিয়ে বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন! আমিন।

ইফতেখার সিফাত
১২/১০/২০২১ ঈ.

সূচিপত্র

নুসাইবা বিনতে কাব

উকবায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলামগ্রহণকারী দুজন নারীর একজন ছিলেন নুসাইবা বিনতে কাব রাদিআল্লাহু আনহা। *'নুসাইবা'* শব্দের অর্থ ভাগ্যবতী। ইসলাম তাকে ভাগ্যবতী করেছিল। ইসলাম গ্রহণ পরবর্তী তিনি মদিনায় ফিরে নারীদের মাঝে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার চালান।

উহুদের যুদ্ধে তার দুজন ছেলে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন সে লড়াইয়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যখন তীরবৃষ্টি চলছিল; তখন তিনি ঢাল-তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং একসময় আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যখন তার জ্ঞান ফিরল, তিনি জানতে চাইলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন?

ফাইজা : ইসলামপূর্ব যুগে একজন নারী ছিল শুধুই ভোগপণ্য। তখন বাজার বসত নারীবিক্রির। লুটপাট করে কাফেলার নারীদের বিক্রি করা হতো—সস্তা পণ্য হিসেবে। যখন যে, যেভাবে চাইত ভোগ করতে পারত। নিজ স্ত্রীকে খেলার বস্তু করতে দ্বিধা করত না। স্ত্রীকে বাজি রাখত। উপহার হিসেবে দিয়ে দিত। কন্যাসন্তান জন্মালে তা নিজের জন্য অভিশাপ ভাবত। পরিণামে জীবন্ত দাফন করে দিত। এমনই ঘটত ইসলামপূর্বযুগে একজন নারীর সাথে।

নুসাইবা : আচ্ছা থাম তো। তুই যে এসব বলছিস; এসবের কোনো প্রমাণ আছে, তোদের কুরআন ছাড়া?

ফাইজাকে থামিয়ে প্রশ্ন করল নুসাইবা।

ফাইজা : নুসাইবা, প্রথমত প্রমাণ হিসেবে আমাদের কাছে কুরআনই যথেষ্ট। আর তোর বোঝার জন্য অমুসলিম এবং নাস্তিক ঐতিহাসিকদের কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

রবার্ট স্পেন্সার, স্যার উইলিয়াম মুর, গিবন, তাদের বর্ণনায় উল্লেখ করেন—ইসলামপূর্ব আরব ছিল রুক্ষ। নারীদের জন্য হিংস্রতা আর ভীতির এক কলঙ্কময় ইতিহাস। নারীদের নারী কম পণ্য ভাবা হতো অধিক। রুক্ষতা ছিল তাদের প্রতি পুরুষদের চিরাচরিত অভ্যাস। তাদেরকে বন্ধক রাখা হতো। কন্যাসন্তান হলে জীবন্ত দাফন করা হতো।[১]

কিন্তু দেখ—ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে। বলা হয়েছে—'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তানকে লালনপালন করল, তাদেরকে আদব শিক্ষা দিল; বিয়ে দিল এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করল—তার জন্য রয়েছে জান্নাত।'[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে—'যার কন্যাসন্তান জন্মাল; অতঃপর সে তাকে কষ্ট দেয়নি, অসন্তুষ্ট হয়নি, এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য দেয়নি, সে সেই মেয়ের কারণে জান্নাতে যাবে।'[৩]

---

[১] Badruddoza, Muhammad (sm) : His Teachings and Contribution, p. 39; Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, 6th edition, 2009.
Robert Spencer, The Truth About Muhammad, p. 34; An Eagle Publishing Company, Washington, DC, 2006.
Sir William Muir, Life of Mahomet, p. 509, london, 1858.
[২] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৫১৪৬।

নুসাইবা : আচ্ছা ফাইজা, তুই যে এতসব ফজিলতের কথা বলছিস, এর সবই তো পিতার জন্য। এতে নারীর মর্যাদা কোথায় বৃদ্ধি পেল? ফাইজা : আচ্ছা নুসাইবা, তুই খেলা দেখিস?

নুসাইবা : হুম দেখি তো।

ফাইজা : খেলায় জিতলে খেলোয়াড়দের অভিনন্দন কেন জানাস?

নুসাইবা : তারা আমাদের দেশকে, দলকে সম্মানিত করছে সকলের সামনে। তাদের দ্বারা দেশের সম্মান বাড়ছে—সেজন্য।

ফাইজা : আচ্ছা এতে কি খেলোয়াড়দের সম্মান বাড়ে?

নুসাইবা : হুম।

ফাইজা : কেন বাড়বে? তারা তো দেশের সম্মান বাড়াচ্ছে, তাতে তার সম্মান বাড়বে কেন?

নুসাইবা : তার জন্যই তো দেশ সম্মানিত হচ্ছে, তার সম্মান বাড়বে না কেন—অবশ্যই বাড়বে।

ফাইজা : আচ্ছা তাহলে দেখা গেল যার জন্য কেউ সম্মানিত হয় সে নিজেও সম্মানিত হয়।

নুসাইবা : হুম হয়।

ফাইজা : তাহলে এখানে কেন এমন ব্যাখ্যা হবে, মেয়ের জন্য পিতা সম্মানিত হলেও মেয়ে সম্মানিত হবে না?

নুসাইবা : ফাইজা, আসলে কী জানিস; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্যাদার কথা বলেছেন—কারণ, তিনিও কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন। অন্যথায় কখনো এ কথা বলতেন না।

ফাইজা : এটাও তোর ভুল ধারণা। তিনজন পুত্রসন্তান জন্মেছিল তাঁর। মেয়ে চারজন। তিনি তো নিজেও একজন পুরুষ ছিলেন, তারপরও কেন বললেন না—'পুরুষ সন্তানকে লালনপালন করলে জান্নাতে দেওয়া হবে?'

সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৯৯১।

নুসাইবা : এটা ছাড়াও ইসলাম বলে—কন্যাসন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। আর পরীক্ষা তো বিপদাপদ দিয়েই করা হয়; তাই নয় কি?

ফাইজা : আচ্ছা তাহলে তুই এখানে একটি হাদিস উল্লেখ করতে চাচ্ছিস। তাহলে হাদিসটি ব্যাখ্যা করা যাক, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'একজন স্ত্রীলোক দুটি মেয়ে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে কিছু চাইল। আমার কাছে একটি খুরমা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে সেটা দিলাম। স্ত্রীলোকটি তার দুমেয়েকে খুরমাটি ভাগ করে দিল। তারপর উঠে বের হয়ে গেল। এ সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। তখন তিনি বললেন—যাকে এমন কন্যাসন্তান দিয়ে কোনো পরীক্ষা করা হয়, অতঃপর সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে। এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে।'[৪]

এখন তুই বল, এখানে কি বলা হলো *'কন্যাসন্তান মানেই পরীক্ষা, বা কন্যাসন্তানই পরীক্ষা?'*

এখানে একজন মহিলার কথা বলা হলো—যার দুটি কন্যাসন্তান আছে। কিন্তু সে অর্থনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল। দুজন কন্যা লালনপালন করা তার জন্য অবশ্যই একটি পরীক্ষা ছিল। এটাকে দলিল করে 'মেয়েদের পরীক্ষা বলা হয়েছে' এমন বলা যায় কীভাবে?

এছাড়া দেখ, আল্লাহ তাআলা বলেন : তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।[৫]

এখন কি তুই বলবি, *'আল্লাহ তাআলা সন্তান জন্ম দিতেই নিষেধ করেছেন, কিংবা অর্থোপার্জন করতে বাধা দিচ্ছেন?'*

নুসাইবা চুপ রইল। কিছু বলল না। ফাইজাই নীরবতা ভাঙল—আচ্ছা এখন বাদ দে। আম্মু ডাকছে, আমি যাই। ভার্সিটিতে কথা হবে।

নুসাইবা : আচ্ছা যা।

---

[৪] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৯৯৫।

[৫] সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১৫।

নুসাইবার বিশ্বাস হচ্ছে না—ফাইজা তাকে এমন জ্ঞান দেবে। তবে শেষ হয়নি। আরও অনেক কথাই জমা আছে নুসাইবার মনে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করবে। দেখা যাক ফাইজা কী জবাব দেয়...।

◆◆◆

'স্ত্রী' দাসী নাকি পরিচ্ছদ?
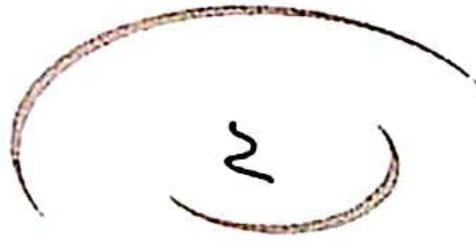
নুসাইবা অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। পড়ালেখায় ভালো। বক্তৃতায়ও বেশ পটু। সুন্দর ভাষাশৈলী। গুছানো কথাবার্তা। আরও ইত্যাদি ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত। এককথায় মডার্ন বলতে যা বোঝায়—তার পুরোটাই পুরোদমে বিদ্যমান তার মাঝে। যুক্তিতর্ক তার পছন্দের বিষয়। যুক্তিনির্ভর কথা বলতে পছন্দ করে। লেখালেখি করে বিভিন্ন ব্লগে। একজন নারীবাদী লেখিকা হওয়ার সাথে সাথে, সেকুলারিজমের সাথে সম্পৃক্ত একজন মুক্তমনা। পাশ্চাত্যধর্মে ধর্মান্ধ যাকে বলে।

সেদিন ফাইজা ক্লাসরুমে বসে ভাবছিল কিছু একটা। হয়তো তার সামনের দিনগুলো নিয়ে। সামনের মাসে তার বিয়ে। ক্লাসের অনেকেরই তা জানা। অজানা ছিল না নুসাইবারও। সে এটা নিয়ে মাঝে মাঝে খোঁচাও দিতে ভোলে না। খোঁচায় খোঁচায় অনেক কথাই বলে ফেলে। ফাইজার তা পছন্দ হয় না। অনেককিছুই বান্ধবীর দুষ্টুমি ভেবে ছেড়ে দেয় ফাইজা।

আজও একই কাণ্ড। ফাইজার আনমনা হয়ে বসে থাকা দেখে নুসাইবার আনন্দ হলো খুব। কিছু কথা গুছিয়ে নিল দ্রুত। এমনিতে যুক্তিতর্কে সে ভালো পারদর্শী। অন্যকে বোঝানোর মহাপণ্ডিত বলা যায়। তার ওপর ভুঁড়ি ভুঁড়ি রেফারেন্স—সে যা ভাবে আরকি। পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়ে বলতে শুরু করল :

নুসাইবা : কীরে, মনখারাপ?

ফাইজা : না রে। এমনিতেই একটু খারাপ লাগছে।

নুসাইবা : তোর তো আগামী দিনে আরও অনেক বিপদ আছে। তার সামনে তো এটা কিছুই না।

ফাইজা : কেন, আমি আবার কী করলাম?

নুসাইবা : সামনে না তোর বিয়ে? বিয়ে মানেই তো একটা পুরুষের জন্য নিজের সব বিলিয়ে দেওয়া। দাসী হয়ে যাওয়া। যেমনটা তোদের ধর্ম বলে। সেই কষ্টের সামনে তো এই মনখারাপ নগণ্য বিষয়।

কিছুটা হেসে মজা নিল নুসাইবা।

ফাইজা : নুসাইবা, বিয়ে মানে যদি হয় পুরুষের জন্য সব বিলিয়ে দেওয়া, তাহলে বিয়ে মানে স্ত্রীর জন্যও সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া।

যেমন বলা হয়েছে :

'তোমরা তাদের পরিচ্ছদ, তারা তোমাদের পরিচ্ছদ।'[৬]

অর্থাৎ স্বামী ছাড়া স্ত্রী উলঙ্গ, স্ত্রী ছাড়া স্বামী। অর্থাৎ দুজন দুজনার। যেমনটা তোরা সিনেমা, উপন্যাস, কবিতায় বলে থাকিস।

শুধু এটাই নয়। অন্যত্র বলা হয়েছে—'পুরুষদের স্ত্রীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনই স্ত্রীদেরও পুরুষদের ওপর অধিকার রয়েছে।'[৭] তারপরও বলবি, *'আমি দাসী হতে যাচ্ছি?'*

একদমে কথাগুলো বলে থামল ফাইজা।

নুসাইবা : ফাইজা তুই জানিস, কুরআন নারীদের প্রহার করার অনুমতি দিয়েছে—সীমিত অপরাধেই? এটা কীভাবে একটি সঠিক ধর্মের বিধান হতে পারে? এটা তো নারীনির্যাতন। তোর তো বিয়ে হচ্ছে; তোরও তো খাওয়া লাগবে। তাই বললাম।

ফাইজাকে আরেকটা খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করল নুসাইবা।

ফাইজা : নুসাইবা, যে আয়াতের কথা তুই বলছিস—চল, সে আয়াত সম্পর্কে কথা বলি। শোন, তুই এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেছিস। দেখা যাক মূলত কী বলা হয়েছে সেখানে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে—'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। কেননা আল্লাহ, একের ওপর অপরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। এজন্য যে—তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীগণ হয় অনুগত। এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করেছেন, তা হেফাজত করে—লোকচক্ষুর আড়ালেও। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যাত্যাগ করো, প্রহার করো। যদি তারা তাতে বাধ্য হয়ে যায়—তবে তাদের জন্য অন্যপথ অনুসন্ধান করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার ওপর শ্রেষ্ঠ।'[৮]

নুসাইবা : আচ্ছা ফাইজা, এখানে এক-কে অপরের ওপর কর্তৃত্ব কেন দেওয়া হলো? সর্বোপরি আমরা তো সবাই মানুষ। তথাপিও কেন মাঝখানে এমন ফাটল তৈরি করা হলো?

---

[৬] সুরা বাকারা : ১৮৭।
[৭] সুরা বাকারা : ২২৮।
[৮] সুরা নিসা : ৩৪।

ফাইজা : দেখ নুসাইবা, একটি দেশে একজন প্রেসিডেন্ট থাকে। সে সবার ওপর কর্তৃত্বশীল। আর একজন মেয়র—একটি পৌরসভার সকলের ওপর কর্তৃত্বশীল।

এখন মনে কর—এই নিয়ম ভেঙে যদি আমরা সবাই প্রেসিডেন্ট হই; তাহলে কি দেশে শান্তি থাকবে? কখনোই না। সেজন্য দেশের সকলের মাঝ থেকে একজনকে প্রেসিডেন্ট বানানো হয়। পৌরসভার সকলের মাঝ থেকে একজনকে মেয়র নির্বাচিত করা হয়। এটা কি অযৌক্তিক মনে হয় তোর কাছে?[১]

নুসাইবা : না।

ফাইজা : তেমনই একটি পরিবার। যদি স্বামী-স্ত্রী সবাই গৃহপ্রধান হয়—ঘরে কি শান্তি থাকবে? ভুলেও না। সেজন্য একজনকে গৃহপ্রধান নির্বাচন করা হয়েছে। এটাতে তো ভুল কিছু দেখছি না।

নুসাইবা : সেটা তো নারীকেও করতে পারত। পুরুষকেই কেন করা হলো?

ফাইজা : একজন পুরুষ প্রকৃতিগতভাবে শক্তিশালী হয়। হয় কঠোর পরিশ্রমী। এর অহরহ প্রমাণ আছে। এটা তোরও অজানা নয়। এর জন্য তোকে প্রমাণ দিতে হবে বলে মনে হয় না। এখন তুই বল গৃহপ্রধান হওয়ার যোগ্যতা কার বেশি?

নুসাইবা : আচ্ছা আমিও যদি ইনকাম করি তাহলে কি আমিই প্রধান হবো?

ফাইজা : আচ্ছা নুসাইবা মনে কর, তুই আর তোর স্বামী একসাথে কৃষিকাজ করছিস। সকালে বের হয়ে রাতে ফিরছিস। ফিরে দেখিস রান্না হয়নি। কাজেই তো ব্যস্ত ছিলি সারাদিন। রান্নার সুযোগই কোথায় পেলি। বাচ্চারা সকাল থেকে না খেয়ে আছে। গোসল হয়নি। ঘর বিশ্রী হয়ে আছে। সারাদিন কাজ করে তখন আর এসব করার পরিস্থিতি না থাকবে তোর—না তোর স্বামীর। তখন তোর বাচ্চারা না খেয়ে মরবে। তুইও। তোর স্বামীও।

তুই বলবি আমরা তো সকালে অফিসে যাব, রাতে আসব। বাড়িতে কাজের লোক থাকবে তারাই রান্নাবান্না করবে। আমরা আসব, খাব আর ঘুমাব। কিন্তু, যিনি গ্রামের কৃষকের স্ত্রী তার কথাও তো ভাবতে হবে—নাকি? আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা সকলের জন্য একটি নিয়ম করে দিয়েছেন।

---

[১] ইসলাম কখনোই গণতন্ত্রকে সাপোর্ট করে না। এখানে ব্যবহৃত প্রেসিডেন্ট কিংবা মেয়রের কথা শুধুই নমুনা। গণতন্ত্রকে মান্য করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। গণতন্ত্র এককথায় কুফরি মতবাদ। তাই কোনো মুসলমানের পক্ষেই এই মতবাদকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বরং এটাকে বর্জন করা অত্যাবশ্যক। মুসলমানদের জন্য এখানে উদাহরণ খলিফা, গভর্নর, কাজি হতে পারে।

যেমন সূর্য আলো দেয়, পৃথিবী তা থেকে গ্রহণ করে। দুজন একই কাজ করে না। যদি পৃথিবী আলো দিত, সূর্যও—তাহলে আর বসবাস উপযোগী থাকত না পৃথিবী কিংবা সূর্য।

ঠিক সেরকমই নারীদের দিয়েছেন ঘরের কাজ, বাচ্চাদের দেখাশোনা, শিক্ষা-দীক্ষা, রান্নাবান্না ইত্যাদি।

আর পুরুষদের দিয়েছেন নিজের এবং নিজেরও পূর্বে পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব। সারাদিন অন্যের কাজ করে হলেও—স্ত্রী-সন্তানের খাবার, পোশাকের প্রয়োজন তাকেই মেটাতে হবে।

পুরুষ, পরিবারের সকলের খাদ্য-পোশাকের ব্যবস্থা করবে। আর স্ত্রীগণ তা ব্যবহার করবে এবং তাদের সন্তানদের বড় করে তুলবে। একটি দেশের নিরাপত্তার জন্য যেমন প্রধানের আনুগত্য প্রয়োজন—হোক খেলাফত অনুযায়ী বা গণতন্ত্র অনুযায়ী। তেমনই পরিবারের শান্তির জন্য পারিবারিক প্রধানের আনুগত্যও তেমন জরুরি। এটাই করতে বলেছেন আল্লাহ তাআলা।

নুসাইবা : আচ্ছা ঠিক আছে এটা বুঝলাম। কিন্তু অবাধ্যতার আশঙ্কা করলেই প্রহার করার কথাটা কি নারীনির্যাতন না?

ফাইজা : তুই যে আয়াতের কথা বলছিস সেই আয়াতের তরজমা হলো : 'যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যাত্যাগ করো, প্রহার করো।' এই আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়—প্রথমে তাদের সদুপদেশ দাও। তাতে কাজ না হলে শয্যাত্যাগ করো। তাতেও যদি কাজ না হয়—মৃদু প্রহার করো'[১০]

নুসাইবা : কিন্তু আয়াতে তো সেরকম কিছুই বলা হয়নি। আমি জেনেছি এটা তোরা ভুল ব্যাখ্যা করিস।

ফাইজা : আচ্ছা নুসাইবা, আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাকিস্থানি লেখকদের বই থেকে পড়ি, তাহলে কি আমরা মুক্তিযুদ্ধের মূল ইতিহাস পাব?

নুসাইবা : না।

---

[১০] তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন।

তার সাথে এর কী সম্পর্ক?

ফাইজা : ঠিক। তাহলে মূল ইতিহাস জানার জন্য বাংলাদেশী লেখকের বই-ই পড়তে হবে। ঠিক সেরকমই কুরআন বুঝতে হলে তাদের কথা চলবে না, যারা কুরআন-বিরোধী। তুই যেহেতু কুরআন বুঝবি, সেটা তোর বুঝতে হবে যেভাবে বুঝিয়েছেন কুরআন যার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্যথায় সেটার অপব্যাখ্যাই হবে। সুতরাং তার করা ব্যাখ্যাই আমাদের নিতে হবে। আর তাফসিরগ্রন্থগুলোতে এখানে 'মৃদুপ্রহার'-এর কথাই বলা হয়েছে। আর সেটাও প্রথমে বোঝানো তারপর বিছানা আলাদা করা, তারপর গিয়ে 'মৃদুপ্রহার'।

যাতে করে বড় কিছু অর্থাৎ—বিচ্ছেদের চিন্তা মাথায় না আসে। এবং বুখারি শরিফেও এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'মৃদুপ্রহার' বলেই। বিয়ে অধ্যায়ে দেখে নিস সময় করে।

নুসাইবা : তোদের নবিই নাকি 'বউ পেটাতেন'। আয়শার বুকে মেরেছিলেন, আমার কাছে রেফারেন্স আছে।

ফাইজা : হুম বুঝতে পারছি। শোন আমিই বলি—মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে বলা হয়েছে : 'আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে একটি থাপ্পড় মারলেন যাতে আমি ব্যথা পেলাম।'[১১]

একটা থাপ্পড়, এটা বউ পেটানো? তুই আজ সারাদিন আমাকে কতগুলো থাপ্পড় মেরেছিস, তার হিসেব আছে?

নুসাইবা : আমি তো এমনিতেই দুষ্টুমি করে মেরেছি।

ফাইজা : আচ্ছা নে আমিও মারলাম, ব্যথা লাগল?

ফাইজা, নুসাইবাকে মৃদু একটি ঘুষি দিল।

নুসাইবা : মারলে তো লাগবেই।

ফাইজা : আচ্ছা নুসাইবা, ব্যথা পেয়েছিস, তাই বলে কি আমি তোকে পিটিয়েছি?

[১১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২/২১২৭।

বন্ধু হিসেবে একটু কিল-ঘুষি একজন আরেকজনকে দেওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। এটার জন্য হাইকোর্টে কেস করতে হবে? আবার অনেক সময় ভুল শুধরানোর জন্যও বুকে মুষ্টিবদ্ধ আঘাত করা হয়। কখনো-বা ভীতি দূর করার জন্য।

এমন আঘাত করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি অভ্যেস ছিল। এ ছাড়াও দেখ; আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা নিজেই বলেন : 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে কখনো কাউকে আঘাত করেননি। কোনো নারীকেও না। খাদিমকেও না।'[১২]

এখান থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ইসলাম প্রহারের পূর্বে বেশকিছু স্টেপ দিয়েছে সরাসরি প্রহার করার কথা বলেনি। এতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, প্রহার করতে অনুৎসাহিত করেছে ইসলাম। রাসুলুল্লাহর কাজ থেকেও এটা প্রমাণিত। আবার প্রহার করলেও খুবই সামান্য, যেটা কোনো ক্ষত পর্যন্ত পৌঁছায় না। বিচ্ছেদের চেয়ে এই মৃদুপ্রহারই কল্যাণকর।

এখন দেখ, ইসলাম স্ত্রীকে প্রহারের বিষয়ে কী বলে—

'স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। যদি তাদের কোনোকিছু অপছন্দ হয়, তাহলে জেনে রাখো, তার মধ্যে আল্লাহ তাআলা অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'[১৩]

আবদুল্লাহ ইবনু যামআহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদেরকে গোলামের মতো প্রহার করো না। কেননা, দিন শেষে তাদের সঙ্গেই তো মিলিত হবে।'[১৪]

এখন বল কোথায় ইসলাম 'বউ পেটানো'র কথা বলল? বরং দেখছি নিষেধ করেছে।
আচ্ছা ক্লাস কর। ম্যাম আসার সময় হয়ে গেছে।

নুসাইবা : হুম।

◆◆◆

[১২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৫১৪৪।
[১৩] সুরা নিসা : ১৯।
[১৪] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫২০৪।

স্রষ্টা কি পুরুষতান্ত্রিক?

নুসাইবা : আচ্ছা ফাইজা, কুরআন-হাদিসের যে বিষয়গুলো নিয়ে তোকে প্রশ্ন করলাম, এসব তো কোরআনেরই অংশ। এগুলো দিয়েই মানুষ কীভাবে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে?

ভার্সিটি থেকে ফেরার সময় ফাইজাকে উদ্দেশ্য করে নুসাইবার প্রশ্ন।

ফাইজা : নুসাইবা, একটি প্রসিদ্ধ কথা আছে না—'অল্প বিদ্যা ভয়ংকর?'

নুসাইবা : হুম। তো?

ফাইজা : তোর হয়েছে সে অবস্থা। প্রথমত, শুধু অনুবাদ পড়ে অনেককিছুই তুই বুঝতে পারবি না। সেজন্য উচিত তোর নিজস্ব চিন্তাভাবনার জগৎটাকে যাচাই করা। বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের পর্দাটা উঠিয়ে ফেলা।[১৫]

তারপর কুরআনুল কারীমের তরজমার সাথে সাথে শানে নুজুল, তাফসিরও পড়া। নয়তো তোকে বিভ্রান্তির জন্য কোরআনের একটি আয়াতই যথেষ্ট। যেমন—নারীরা তোমাদের শস্যক্ষেত।'

নুসাইবা : আচ্ছা তাহলে আমি যদি কুরআন বুঝতে চাই—কীভাবে শুরু করলে ভালো হবে?

ফাইজা : প্রথমেই কুরআন কারিম অধ্যয়ন শুরু করলে বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রচুর। সেজন্য সবচেয়ে ভালো হয় আরবি শিখে আরবিতে কুরআন বুঝে নেওয়া। এটা হবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা। তা ছাড়াও যদি পড়তে চাস তাহলে 'তাফসিরে মারেফুল কুরআন' পড়তে পারিস। শানে নুজুল, তাফসিরসহ পড়তে পারবি। বিভ্রান্তির আশঙ্কা ক্ষীণ।

নুসাইবা : আচ্ছা অনুবাদক, সংগ্রাহক, বর্ণনাকারী, সিরাত রচনাকারী এদের সব পুরুষরাই কেন—নারীরা কেন হতে পারে না?

ফাইজা : কেন নয়! সর্বোচ্চ হাদিস বর্ণনাকারীদের দ্বিতীয়জন হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা। তা ছাড়া হাফসা রাদিআল্লাহু আনহাসহ আরও অনেক নারী সাহাবী হাদিস বর্ণনা করেছেন। সিরাতও লিখেছেন অনেকে।

---

[১৫] বর্তমান পুরো বিশ্বের মনস্তত্ত্বে রাজত্ব করা পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের মানসিকতা এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছে যে আমরা তাদের মতোই ভাবি; যার ভিত্তি ন্যায়ের ওপর নয়—ইচ্ছার ওপর। যা কোরআনের বিপক্ষেই সবক দেয় আমাদের সবসময়।

নুসাইবা : কিন্তু তাদের সংখ্যা তো খুবই সীমিত!

ফাইজা : দেখ—আমরা বিজ্ঞানের থিওরিগুলো পড়ি। অবশ্যই এসব উপকারী। যারা এগুলো আবিষ্কার করেছে তারা আমাদের নিকট সম্মানিত। কিন্তু একটা বিষয় দেখ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সেরা দশজন বিজ্ঞানীর একটি লিস্ট তৈরি করেছে। তারা হলেন–

স্যার আইজাক নিউটন, লুইস পাস্তুর, গ্যালিলিও, মেরি কুরি, আলবার্ট আইনস্টাইন, চার্লস ডারউইন, অটো হান, নিকোলা তেসলা, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, অ্যারিস্টটল।

এখন দেখ, শুধু 'মেরি কুরি' ব্যতীত এই লিস্টে কোনো নারীই নেই। এজন্য কি তুই বলতে পারিস তারা ভুল নির্বাচন করেছে বা এটা নারীর প্রতি অসম্মানজনক?
নুসাইবা : না।

ফাইজা : তাহলে তারা পুরুষ হয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে, বর্ণনা করেছে, এতে তাদের দোষটা কোথায়?

নুসাইবা : আচ্ছা ফাইজা দেখ, কুরআনে যখন আল্লাহর কথা বর্ণনা করা হয়েছে 'আমি'র জায়গায় 'আমরা' বলা হয়েছে। আবার দেখা যাচ্ছে সেখানে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে 'পুরুষবাচক'। এটা কি স্রষ্টার পুরুষ হওয়ার প্রমাণ না?

ফাইজা : নুসাইবা, কুরআন নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায়। অর্থাৎ আরবদের ভাষায়। সুতরাং সেভাবেই ব্যবহার হয়েছে—যেভাবে আরবরা ব্যবহার করেছে। না হলে তারা কুরআন বুঝতে পারবে না। এখন দেখা যায়—আরবরা যখন সম্মানিত কোনো ব্যক্তি বিষয়ক কথা বলে তখন তারা 'তুমি' একের জায়গায় 'তোমরা' বহুবচন এবং 'আমি' একবচনের জায়গায় 'আমরা' বহুবচন ব্যবহার করে। আর সেটা 'পুরুষবাচক' করে। সুতরাং যেহেতু আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল হয়েছে, তাই এরকমই নাজিল হয়েছে।

এখন বলবি তাহলে এরকম ভাষায় কেন কুরআন নাজিল হলো?

নুসাইবা, একটি ধর্মগ্রন্থের তো সে ভাষাই হওয়া উচিত যা যুগশ্রেষ্ঠ। আর সে যুগে ভাষা-সাহিত্যে সর্বোচ্চ ছিল আরবি ভাষা। কবি-সাহিত্যিকদের ছড়াছড়ি ছিল তখনকার আরবে। তারা কবিতার আসর জমাত। কবিতার শেষ অক্ষর থেকে কবিতা শুরু করত। কবিতার প্রতিযোগিতা করত।

ভাষায় ছিল তাদের বিশাল পাণ্ডিত্য। তখন আরবিই ছিল সকল ভাষার চেয়ে উন্নত ভাষা। সুতরাং কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল হওয়াই উত্তম ছিল।

আরেকটি বিষয় শোন, পুরুষের একবচন শব্দ 'রাজুলুন'—অর্থ একজন পুরুষ। আর বহুবচন হলো 'রিজালুন'—অর্থ তিন বা ততোধিক পুরুষ। আরবি লোগাত অনুযায়ী এই 'রিজালুন' পুরুষবাচক শব্দটি আরবি সাহিত্যে 'স্ত্রীবাচক' হয়ে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সেটা স্ত্রীবাচকের বিধানে। এখন তুই বল, এতে কি পুরুষ—নারী হয়ে গেল? হলো না তো! সে পুরুষই রইল। ঠিক তেমনই, এখানে পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার হলেই স্রষ্টা পুরুষ হবেন—এটা প্রমাণ হয় না।

নুসাইবা : ফাইজা, একটি আয়াতে বলা হয়েছে : 'তিনি কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেননি, তার কোনো সন্তানও নেই।'[১১] এখানে তো বলা হলো না 'তার কোনো স্বামীও নেই।' এর দ্বারা কি বোঝা যায় না তিনি পুরুষই?

ফাইজা : শোন, হিন্দুধর্মানুযায়ী ভগবান শিব এবং পার্বতীর সন্তান হলো গনেশ। খ্রিস্টধর্মানুযায়ী স্রষ্টা এবং মারয়মের সন্তান যিশুখ্রিস্ট। অর্থাৎ সবার ধারণা তিনি পুরুষ। আল্লাহ তাআলা এসব বহু স্রষ্টাতত্ত্ব এবং তাকে পুরুষ জ্ঞান করাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য বলেছেন 'তিনি স্ত্রী গ্রহণ করেননি, এবং তার কোনো সন্তানও নেই।' অর্থাৎ গনেশ বা যিশু তার পুত্র নন। পার্বতী আর মারয়মও স্ত্রী নন। মোটকথা হলো—হিন্দু-খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টার স্ত্রী-পুত্র বিষয়ে যেসব কথা বলে—সেগুলোকে ভুল প্রমাণিত করা।

নুসাইবা : আচ্ছা, তাহলে তুই বলছিস স্রষ্টার কোনো লিঙ্গ নেই, তিনি হিজড়া?
ফাইজা : নুসাইবা, ধর তুই একজন উদ্ভাবক। তুই একটা জিনিস আবিষ্কার করলি। যেটা দেখতে বিড়ালের মতো। তার মানে কি ধরে নেব 'তুই বিড়াল?'
নুসাইবা : না।
ফাইজা : যিনি লিঙ্গের আবিষ্কারক, তার জন্য কেন লিঙ্গ লাগবে? আর হিজড়ারাও লিঙ্গের অধিকারী। হয়তো পুরুষ না হয় নারী। কিন্তু স্রষ্টার কোনো লিঙ্গই নেই। সুতরাং কুরআনকে, স্রষ্টাকে পুরুষতান্ত্রিক বলা যায় না। এরকম আরও অনেককিছু জানতে পারবি কুরআন অধ্যয়ন শুরু করলে। তাই তোকে বলি কুরআন পড়, তবে উত্তম পন্থায়।

[১১] সুরা জিন : ৪।

কুরআন কি পুরুষকেন্দ্রিক ?
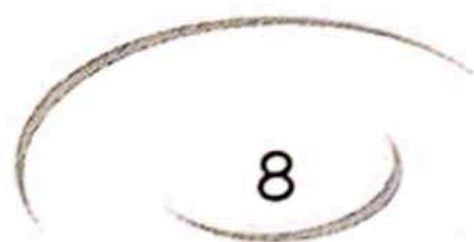
নুসাইবার মস্তিষ্কজুড়ে চলছে ভাবনার লড়াই। সে সন্দিহান কোনটা তার পথ। কোন পথেই-বা মুক্তি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নে সে সবসময়ই অবিশ্বাসী ছিল। এখনো নিজেকে অবিশ্বাসীই ভাবছে। তবে তার অবিশ্বাসী মনে বিশ্বাসের একটি ঝলক পড়েছে। এই ঝলক তাকে একপলকের জন্যও স্বস্তি দিচ্ছে না। কোনো এক অজানা আকর্ষণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে—অজানা কোনো প্রান্তে। যার সম্পর্কে তার জ্ঞান শূন্যের কোঠায়। তবে তার মনে ক্ষীণ একটি আশা উঁকি দেয়। ক্ষীণ সেই আশাটি কী—বুঝতে পারে না সে নিজেও।

নুসাইবা কুরআনুল কারিমের তাফসির পড়তে শুরু করেছে। শব্দার্থই নয় শুধু—সাথে ব্যাখ্যাও। শাব্দিক অর্থে খটকা লাগলে ব্যাখ্যা পড়ার সাথেই সেটা দূর হয়ে যায়। কতো সুন্দর সাজিয়ে-গুছিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই গ্রন্থটি। সে শুনেছে এই কুরআন নাকি নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুরাও শুনতে যেত। আড়ালে লুকিয়ে শুনত। তারাই আবার সবাইকে নিষেধ করত কুরআন শোনা থেকে। কিন্তু নিজেরা লোভ সামলাতে পারত না। নুসাইবা শুনেছে—নবির ওপর, তার সাথিদের ওপর এই কুরআনের জন্যই চলেছে অসংখ্য জুলুম, নির্যাতন। অথচ তারা ছিল নিষ্পাপ। সমাজে তারা ছিল সর্বজনস্বীকৃত সম্মানিত ব্যক্তি। শুধ কুরআনকে ধারণ করার জন্য তাদের সহ্য করতে হয়েছে অকথ্য গালাগাল আর লাথি-ঘুসি।

নুসাইবার মনে হলো—আরবের লোকেরা ভয় পেত, তাই চাইত; মানুষ মুহাম্মাদের কুরআন না শুনুক। তারা বিশ্বাস করত যদি কেউ একবার কুরআন শোনে, তাহলে সে মুহাম্মাদের দিকে ধাবিত হবে। সেজন্যই তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করত কেউ কুরআন না শুনুক, না বুঝুক। যেহেতু আরবদের ভাষাই ছিল কোরআনের ভাষা, তাই তারা সে কথাগুলো খুব ভালো অনুভব করতে পারত। এজন্য কুরআন হয়ে গিয়েছিল কাফেরদের সবচেয়ে ভয়ানক শত্রু।

নুসাইবা সুরা ফাতেহা শেষ করে সূরা বাকারা আরম্ভ করল। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াত—ইহা এমন এক কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। মুত্তাকিদের জন্য হেদায়েতস্বরূপ—পড়ে নুসাইবা থেমে গেল।

কুরআন শরিফ বন্ধ করে উঠে যাবে; এমন সময় মনে হলো কোথায় যেন এই আয়াত নিয়ে কিছু একটা পড়েছিল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এখানে সবকিছু ব্যবহার করা হয়েছে 'পুরুষবাচক' এমনকি মুত্তাকি শব্দটিও।

কিন্তু কেন, মুত্তাকি কি নারীরা হতে পারে না? নাকি কুরআন নারীদের জন্যই না। তার নব্য জন্মানো বিশ্বাসের শিকড়ে কেমন যেন কুঠারাঘাত পড়ল।

সে তৎক্ষণাৎ ফাইজাকে ফোন করল। ফাইজা ফোন ওঠানোর সাথে সাথে নুসাইবা বলতে শুরু করল—

নুসাইবা : তুই বললি কুরআন শুধুই পুরুষের জন্য নয়—বরং সবার জন্য। কিন্তু শুরুতেই সবকিছু দেখছি পুরুষবাচক। বলা হয়েছে—হেদায়েত মুত্তাকিদের জন্য। মুত্তাকি শব্দটাও পুরুষবাচক। তার মানে কুরআন আমাদের জন্য লেখাই হয়নি। এটা শুধু পুরুষদের জন্য। তাই নয় কি?

ফাইজা : নুসাইবা, একটু ঠান্ডা হ! কথা শোন, নারী-পুরুষ উভয়েই উদ্দেশ্য এমন স্থলে সুরা ফাতেহাসহ অন্য জায়গাগুলোতেও শুধু পুরুষবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্য তোর ধারণা কুরআন পুরুষের জন্য; নারীর জন্য নয়—তাই না?

নুসাইবা : হ্যাঁ। এমনকি 'মুত্তাকি' শব্দটিও।

ফাইজা : আচ্ছা শোন, এখানে তোর আরবি ভাষা বিষয়ক জ্ঞান না থাকায় ভুলটা হচ্ছে। প্রথমেই তোকে দেখতে হবে আরবি ভাষার নীতি কী! কুরআনের ভাষা আরবি, কিন্তু সেটা প্রথমে একটি ভাষা। আর সেই ভাষাতেই কুরআন নাজিল হয়েছে। এ বিষয়ে আরবি ভাষার নিয়ম হলো : যদি কোথাও পুরুষবাচক, স্ত্রীবাচক উভয়ই উদ্দেশ্য হয় তখন সেখানে পুরুষবাচক হবে। একান্ত প্রয়োজন হলে স্ত্রীবাচক ব্যবহার হবে। না হয় পুরুষবাচকই ব্যবহার হবে।

এখানে শুধু সেই নিয়মেরই প্রতিফলন ঘটেছে। অন্যকিছু না।

নুসাইবা : বাহ! এখানেও দেখছি সেই পুরুষদেরই সাপোর্ট।

ফাইজা : এটা আরবি ভাষায় নীতি। তুই আর আমি আরবি ভাষা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি না। কারণ এটা আমাদের ভাষা না। আচ্ছা তুই বাংলাদেশ সংবিধানে বিশ্বাসী?[১১]

নুসাইবা : হ্যাঁ, অবশ্যই।

[১১] কুফরি মতবাদ গণতন্ত্রের ওপর নির্মিত সংবিধানকে বিশ্বাস করা কুফরি।

ফাইজা : তুই এখন গুগলে সার্চ করে 'বাংলাদেশ সংবিধানের ইংরেজি অনুবাদ' দেখবি।

নুসাইবা : আচ্ছা দেখব।

ফাইজা : না তুই এখনই দেখ। এই মুহূর্তে সার্চ কর।

নুসাইবা : আচ্ছা ঠিক আছে।

নুসাইবা ফোন রেখে কম্পিউটারে সার্চ করল। চোখ বুলাল বাংলাদেশ সংবিধানের ইংরেজি অনুবাদে। পুরুষ-নারী উভয়ে উদ্দেশিত সকল 'সম্বোধন' করা হয়েছে পুরুষবাচক শব্দ দিয়ে। কোথাও স্ত্রীবাচক ব্যবহার করা হয়নি।

বাংলাদেশ সংবিধান এমনটা করলে যদি অপরাধ না হয়; তবে কুরআনে ব্যবহার করলে কেন দোষ হতে যাবে? এটাও যেমন নারীর প্রতি অনধিকার চর্চা নয়—সেটাও তো তেমনই। তাহলে এটা নিয়ে এতো উচ্চবাচ্য কেন? এটার একমাত্র কারণ কি ধর্মদ্রোহীতা? তা ছাড়া অন্য কিছু কি আদৌ আছে?

নুসাইবার ভুল ভাঙল। দীর্ঘ একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তবে সেটা স্বস্তির। পুনরায় কুরআন শরিফ খুলে পড়তে শুরু করল নুসাইবা। তবে আগের আর এখনকার পড়ার মাঝে বেশ তফাত আছে। তফাতটি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের।

বোরকা সমাচার
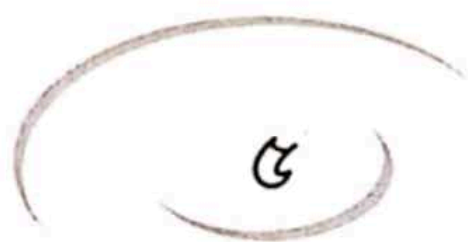
নুসাইবার বাবা একজন সাহিত্যমনা। সাহিত্যচর্চা তার নেশা। প্রিয় লেখক—হুমায়ুন আজাদ। আদর্শ হিসেবেও অনুসরণ করেন তাকে। মেয়ে নুসাইবার অবিশ্বাসী হওয়ার পিছনের কারণও তিনি। এটা নিয়ে তিনি বেশ গর্ববোধ করেন। তার মেয়ে তার মতোই হয়েছে—এটা তো গর্বেরই বিষয়। তা ছাড়া নুসাইবার মা তার এই ধর্মদ্রোহীতার বিরোধিতা করেন। তিনিও স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটি করেন। নুসাইবা তার পক্ষ নেয়। স্ত্রী তখন কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এটা তার খুব সুখের মুহূর্তগুলোর মধ্যে সেরা একটি মুহূর্ত।

প্রতিদিনকার নতুন ভোর নতুন কিছু নিয়ে আবির্ভূত হয়। এমন কিছুও হয়—যার জন্য কেউ প্রস্তুত থাকে না আগ থেকে। আজকের সকালটিও সেরকম হলে কেই-বা আটকাতে পারে! রুটিন অনুযায়ী পত্রিকা হাতে সোফায় আরাম করে চা খাচ্ছিলেন তিনি। নুসাইবা প্রস্তুত হয়ে ভার্সিটিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। নুসাইবাকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি। নিজের মেয়েকেই চিনতে পারছিলেন না। কেমন অপরিচিত অপরিচিত।

নুসাইবা কালো বোরকায় আবৃত হয়ে বের হয়েছে—এমনটা কখনো দেখা যায়নি। ভাবাও প্রায় অসম্ভব। কারণ তিনি জানেন না 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান।'[১৮] তিনি জানেন মুক্তচিন্তার নামে একগাদা বস্তাপচা পক্ষপাতমূলক কথাবার্তা। আর তার সে মুক্তচিন্তা বলে বোরকা একটি সেকেলে 'কালো বস্তা'—যা নারীর অনিচ্ছায় জোরপূর্বক পরান হয়। কিন্তু তারই মেয়ে এ পোশাকে!

বের হওয়ার আগমুহূর্তে নুসাইবাকে ডাকলেন তিনি–

বাবা : কোথায় যাচ্ছিস? আর তুই এটা কী পরেছিস?

নুসাইবা : ভার্সিটিতে যাচ্ছি বাবা। এটা বোরকা, কেন চেনো না তুমি?

বাবা : ঠাট্টা করছিস আমার সাথে? এসব কালো ভুতুড়ে কাপড় পড়েছিস কেন?

নুসাইবা : ভালো লাগল তাই পরলাম।

বাবা : এই কালো বস্তা তোর ভালো লাগল?

[১৮] সূরা আনআম : ৩৯।

নুসাইবা : হ্যাঁ বাবা, লাগল বলেই তো পরলাম। সবার রুচি তো আর এক না। একেকজনের পছন্দ একেকরকম। যেমন তোমার পছন্দ প্যান্ট-শার্ট। কারও তো বোরকা-হিজাবও হতে পারে। সবারই তো নিজ পছন্দের স্বাধীনতা রয়েছে। এতে তো কারও নারাজ হওয়ার কথা না।

বাবা : তুই কি মুসলিমদের ধর্মানুযায়ী পর্দা করা শুরু করেছিস?

নুসাইবা : করলেই-বা সমস্যা কীসে?

বাবা : সে অনুযায়ী পর্দা করলেও তো ভালো। তাহলে তো এভাবে কালো বোরকায় ভূতের মতো হাত-পা-মুখ ঢাকতে হতো না।

নুসাইবা : কীভাবে জানলে ঢাকতে হতো না?

বাবা : কুরআনেই তো বলা হয়েছে : 'তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান; তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এবং তারা যেন তাদের ওড়না তাদের বক্ষদেশে ফেলে রাখে।'[১১] তারপর বলা হয়েছে—কাদের সাথে পর্দা করবে। এখানে তো শুধু বুক ঢাকতে বলা হয়েছে; তুই কোথায় পেলি বোরকা পরে হাত-পা-মুখ ঢাকতে হবে?

নুসাইবা : বাবা, এখানে সাধারণত প্রকাশমান বলতে বোঝানো হয়েছে যা সাধারণত প্রকাশিত থাকে। অর্থাৎ কাপড় পরিধানের পর কাপড়ের বাহিরের যে অংশ—সেটা। ধরো, একজন বোরকা পরল। তাহলে সাধারণত প্রকাশমান দ্বারা উদ্দেশ্য তার বোরকা। যা দেখা যাচ্ছে। প্রয়োজনবশত হাত এবং মুখমণ্ডল খোলাও এর সাথে সম্পৃক্ত।

মোটকথা—সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় এমন কিছুই প্রকাশ করা যাবে না। সৌন্দর্য ঢেকে রাখতে হবে। তবে প্রকাশ করতে পারবে মাহরাম ব্যক্তিদের সামনে। অর্থাৎ যাদের সাথে পর্দার প্রয়োজন নেই। তাদের বিস্তর একটি লিস্ট এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

---

[১১] সুরা নুর, ৩১। মেয়ের সামনে হওয়ায় আয়াতের শুরুর অংশের তরজমা বাদ দেন তিনি : 'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন—তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের গোপন অঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদি, কামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'

আর সৌন্দর্য অপ্রকাশিত রাখার জন্য গোটা শরীর যেহেতু ঢেকে রাখতে হবে; বোরকা ছাড়া অন্য কোনো কাপড়ে তা সম্ভব হয় নয়। এজন্য বোরকা পরতে হবে।

আর তা ছাড়া বাবা, বোরকা পরার আরেকটি সুবিধার বিষয় আছে। কালো কাপড়ের বস্তা ভেবে ছেলেরা একটু দূরে-দূরেই থাকে। কাছে ঘেঁষতে চায় না। যেটা পর্দার জন্য আরও বেশি লাভজনক। সেজন্য বোরকা, পর্দার জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।

ওহ হো বাবা, তোমার জন্য ক্লাসে লেট হয়ে যাচ্ছে। যাই এখন!

বাবা : শুনে যা।

নুসাইবা : সময় নেই বাবা। আসি এখন। আসসালামু আলাইকুম।

বাবা : নুসাইবার মা, নুসাইবার মা, আমার মেয়েকে তুমি নিজের মতো বানাচ্ছ, তাই না! তোমার খবর আছে।

মায়ের ওপর বেশ ক্ষিপ্ত মনে হলো বাবাকে।

◆◆◆

পুরুষের হুর, নারীর জন্য কী?
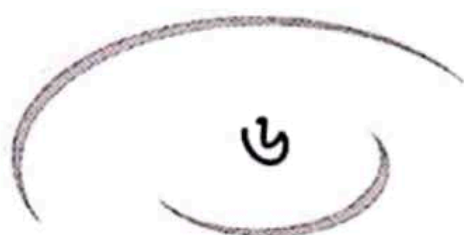
নুসাইবা আজ বোরকা পরে এসেছে। অন্যকে বোরকা না পরার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী মেয়েটি আজ নিজেই বোরকা পরিহিতা। অনেকে অনেককিছুই বলাবলি করছে। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলছে—'সূর্য আজ কোনদিকে?' এসব নিয়ে কানাকানি হবে নুসাইবা তা আগ থেকেই জানে। তাই তেমন কান দিচ্ছে না সেসবে। তা ছাড়া কেউ সরাসরি তাকে কিছু বলতেও আসেনি।

এক সময় শার্ট-প্যান্ট পরে একমঞ্চে বক্তৃতা দিত নুসাইবা আর রেশমি। বিতর্ক করত নাস্তিকতার পক্ষে। রেশমি আজ প্রিয় বান্ধবীকে এভাবে দেখে কঠিনভাবে দুঃখ পেল। তাই কিছু না বলে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না।

রেশমি : নুসাইবা, আজ হঠাৎ বোরকা পরে এলি যে?

নুসাইবা : পরলাম। তাতে সমস্যার তো কিছু দেখছি না।

রেশমি : হাত-পা-মুখ ঢেকে ভূত সাজা কেমন দেখায় বল! আরে, জীবনটাকে উপভোগ কর! এসব গোঁয়ার্তুমি বাদ দে। ক্লাস শেষে চল, একটা পার্টি আছে।

নুসাইবা : রেশমি, বস তো! আমার কথা শোন একটু! আমি আমার আজকের আর পূর্বের একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করি তোর সাথে। জানিস তো আমি আর ফাইজা প্রায়ই একসাথে আসি। ও বোরকা পরে আসে। ওর সাথে যখন আসি তখন ছেলেরা তেমন কোনো ইভটিজিং করে না। কিন্তু যেদিন একা আসি, অনেক বেশি ইভটিজিংয়ের শিকার হই। আর ইভটিজিং একটা মেয়ের পক্ষে কতোটা ক্ষতিকারক—এটা তুই ভালো বুঝিস। কিন্তু আজ যখন আমি ভার্সিটিতে এলাম, একাই ছিলাম। কেউ আমাকে কিচ্ছু বলেনি। ইভটিজিংও করেনি। বুঝতেই পারছিস ভয়ংকর একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম। ধরে নিলাম ছেলেরা খারাপ কিছু করত না। কিন্তু ভয় তো একটা থেকেই যাচ্ছে—যদি খারাপ কিছু করে বসে? বোরকা পরার মাধ্যমে সে ভয়টা না থাকলে, খারাপ কী?

রেশমি : তোদের ধর্ম পরতে বলে দেখে তোরা বোরকা পরিস, এসব ভেবে পরিস না।

নুসাইবা : হুম ঠিকই বলেছিস। তবে তোর জানা দরকার আমাদের ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

যেমন বলা হয়েছে :

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণকরে দিলাম।'[২০] এখন বল—একটা ধর্ম কীভাবে পরিপূর্ণ হবে যদি তাতে একজন নারীর সুরক্ষার বিধান না থাকে!

ধর্ম তো সে বিধানগুলো দুনিয়াতে দেবে; যা মানুষের জন্য উপকারী। সুতরাং এটা ধর্মের বিধান এবং এতেই রয়েছে আমাদের জন্য উপকার।

রেশমি : হ্যাঁ। তোদের তো আবার যারা ধর্ম মানবে তারা জান্নাতে যাবে। আচ্ছা পুরুষদের তো জান্নাতে হুর দেওয়া হবে—সে লোভে তারা জান্নাতে যাওয়ার কাজ করে। কিন্তু মেয়েদের তো হুরও দেওয়া হবে না, তারা কীসের লোভে জান্নাতে যেতে চাইবে?

নুসাইবা : রেশমি, জান্নাতে যে শুধু হুরের জন্যই যাবে মানুষ—এমন না। আর জান্নাতে সবচেয়ে বড় উপহার যে হুর—এমনও কোনো বিষয় না। যেমন বলা হয়েছে : 'অন্য কোনোকিছুই জান্নাতবাসীদের নিকট মহান আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক প্রিয় হবে না।'[২১]

এখান থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়—জান্নাতের প্রধান প্রাপ্তি হুর নয়, বরং মহান রব্বে কারিমের সাক্ষাৎ। আর এটা সবার জন্যই, হোক নারী কিংবা পুরুষ। আবার একটা বিষয় দেখ, বলা হয়েছে : 'সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা-কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং যা-কিছুর তোমরা ফরমায়েশ করবে। এগুলো পাবে ক্ষমাশীল পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে আতিথেয়তাস্বরূপ।'[২২]

আবার অন্যত্র বলা হয়েছে : 'সেখানে রয়েছে যা-কিছু মন চায় এবং যা-কিছুতে নয়ন তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।'[২৩]

অর্থাৎ—তুই যদি অলংকার চাস, অলংকারই দেওয়া হবে। শরাব চাস, দেওয়া হবে। তোর জন্য সঙ্গী চাস, সঙ্গী পাবি। পুরুষদের জন্য বলা হয়েছে : 'আর তাদেরকে দেওয়া হবে আয়তলোচন হুর।'[২৪] অর্থাৎ পুরুষকে এরকম সঙ্গী দেওয়া হবে।

---

[২০] সুরা মায়িদা : ৩।
[২১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৪৬৭।
[২২] সুরা হা-মিম সাজদা : ৩১।
[২৩] সুরা যুখরুফ : ৭১।

এখন তুই মহিলা হয়ে যদি চাস; হুরের সাথে বসে গল্প করবি, তাহলে তাই দেওয়া হবে। আর যদি চাস ছেলে খাদেম (গেলমান)-এর সাথে গল্প করতে—তাও পারবি। আর তোর স্বামী তো আছেই।

রেশমি : তার মানে তুই এতোগুলো সতিনের সাথে ঘরসংসার করবি?

নুসাইবা : একাধিক বিয়ে কখনোই খারাপ কাজ নয়। এটাকে খারাপ ভাবাটা বোকামি বৈ কিছুই না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন লোকের অভাব নেই যাদের স্ত্রী ছিল অনেক। এবং তারা ছিলেন সম্মানিত। আবার তুই যদি মানবতাবাদী[১৭] হোস, তাহলে তোর অবশ্যই জানা আছে পৃথিবীতে 'নারীর সংখ্যা বেশি'—সেজন্য একাধিক বিয়ে করাটা কখনোই খারাপ নয়, বরং ভালো। আর তাই এখন দেখার বিষয় হলো স্বামী কাকে বেশি ভালোবাসে। অন্য স্ত্রীদের ওপর কার কর্তৃত্ব চলে। বলা হচ্ছে জান্নাতি রমণীদের মাঝে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হবে পৃথিবীর স্ত্রী। এবং সে সবার সর্দার হবে।

রেশমি : আচ্ছা বল তো তোর মাথাটা কীভাবে নষ্ট হলো, কারও প্রেমেটেমে পড়েছিস নাকি?

নুসাইবা : হা হা হা। শোন—অনেকের অনেককিছুই আমি পড়েছি। শুনেছি। জেনেছি। যেগুলো আমাকে টেনে নিয়েছে আরও অধিক পড়ার দিকে। আমি যখন কুরআন পড়া শুরু করলাম; তার সাথে মিলিয়ে যখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলাম, তখন মনে হলো—পর্দা শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়—সকলের জন্যই উপকারী। নারীর সম্মান রক্ষা করা, ইসলামেরই অংশ। বল তো নারীর নিরাপত্তার জন্য এর থেকে ভালো কোনো ব্যবস্থা আছে কি? থাকলে দেখা আমাকে। নেই।

রেশমি কিছু বলল না। নুসাইবাও না।

[১৬] মেয়েদের জান্নাতে যৌনতা-বিষয়ক কথা বলা হয়নি। এর পিছনে কারণ এটাও, মেয়েরা যৌনতা বিষয়ে এতোটা সহজে অভ্যস্ত নয়; যেমনটা পুরুষ।

[১৭] হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ একটি কুফরি মতবাদ। এখানে শুধু উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।
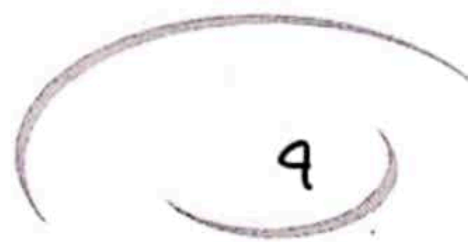
ইসলাম কি নারীকে ঠকিয়েছে?

ক্লাস শেষ। নুসাইবা আর রেশমি ফিরছিল। রেশমির মগজে নুসাইবার কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। সাথে সাথে আরও কিছু ভাবনা। বিতর্কে ঠকে যাওয়াটাও অপমান। জিততে হয় যেকোনো মূল্যে। রেশমির মাথায় হঠাৎ একটি প্রশ্ন এল। সাথে সাথে উগড়েও দিল—

রেশমি : নুসাইবা, তুই যে বললি জান্নাতে যে—যা চাইবে তাই পাবে। জানিস, এখানেও তোর একটা ভুল রয়ে গেছে, কিংবা ভুল ধারণা, ভুল চাওয়া। দেখ, 'যে যা চাইবে তাই পাবে'—বলতে গিয়ে এখানে আরবি শব্দ কুম (كم) ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা পুরুষবাচক। যার মানে দাঁড়ায় এটা বলা হয়েছে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। নারীরা যা চাইবে তাই পাবে না। অর্থাৎ নারীদের ঠকানো হবে ওপারেও।

নুসাইবা : সত্যি বিষয়টা ভাবার মতো। কিন্তু তার জন্য—যে আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। শোন, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী 'পুরুষ-মহিলা দুজনই উদ্দেশ্য এমন জায়গায় (كم) পুরুষবাচক সর্বনামই ব্যবহৃত হয়।'

রেশমি : তাহলে তো আরবি ভাষাটাই নারীদের অবমূল্যায়ন করেছে। এরকম ভাষায় কেন কুরআন নাজিল হলো?

নুসাইবা : বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক ভাষা 'ইংরেজি'। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানিত লেখা 'বাংলাদেশ সংবিধান'। যার অবমাননার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সেই সংবিধানের ইংরেজি অনুবাদ যদি দেখিস—তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাবি, সেখানেও একইরকম ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে পুরুষ-মহিলা উভয় লিঙ্গই উদ্দেশ্য, সেখানে পুরুষবাচক সর্বনামই ব্যবহার হয়েছে। তাই বলে কি তুই 'বাংলাদেশ সংবিধান' বর্জন করতে পারবি?

রেশমি : সংবিধানের কথা বাদ দে। কিন্তু কুরআন শরিফেই তো এমন অনেক আয়াত আছে—যেখানে নারী-পুরুষ আলাদা বলা হয়েছে। যেমন আলে ইমরানের ১৯৫ নম্বর আয়াত। তো এখানে বললে সমস্যার কী ছিল?

নুসাইবা : যাক তুই স্বীকার করলি বাংলাদেশ সংবিধানের চেয়ে কুরআন নারীকে অধিক সম্মান দিয়েছে। তারপর তোর সংশয় দূর করা যাক! প্রথম কথা হলো সাধারণত এভাবে ব্যবহৃত হয় আরবি ব্যাকরণে। আর আরবি ভাষার সর্বোচ্চ সাহিত্যপূর্ণ গ্রন্থ হলো আল-কুরআন।

জানা যায়, সে সময়ের আরবের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল কোরআনের মতো করে একটি সুরা বানিয়ে দিতে। কিন্তু কেউ-ই তা পারেনি।[২৬] তা ছাড়া কুরআনুল কারিম এতোটাই শ্রুতিমধুর ছিল—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুরাও তা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনত। আর তোকে আগেই বলেছি ব্যাকরণ অনুযায়ী সেখানে পুরুষবাচকই ব্যবহার হয়।

আর সুরা আলে ইমরানের যে আয়াতের কথা তুই বললি—সেটাতে বলা হয়েছে : 'আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোনো নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না।'[২৭] এখানে নর-নারী আলাদা করা হয়েছে। তোর দাবি অনুযায়ী হা মিম সাজদার ৩১ নম্বর আয়াতেও—জান্নাতে তোমাদের জন্য রয়েছে, যা-কিছু তোমাদের মন চাইবে—এটা হতে পারত। তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যেত এটা যে সকলের জন্য।

কিন্তু রেশমি, তুই এর পরের অংশটুকু খেয়াল করিসনি। যেখানে বলা হয়েছে, 'তোমরা একে অপরের অংশ।' এখানেও পুরুষবাচক (كم) সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তুই যদি পূর্বের কথার সাথে মিলিয়ে পড়িস তাহলে কখনো সম্ভব না এটা বলা—'এখানে শুধু পুরুষ উদ্দেশ্য।' কিন্তু ব্যবহার হয়েছে পুরুষবাচক সর্বনামই। কারণ সেই আরবি ব্যাকরণ। শুধু আরবি না বর্তমান সময়ের আন্তর্জাতিক ভাষাখ্যাত ইংরেজিতেও ঠিক এমনই ব্যবহার হয়ে থাকে।

এখানকার উদ্দেশ্য পুরুষ-নারী উভয়েই। তেমনই 'তোমরা যা চাইবে তাই পাবে'-এর স্থানেও পুরুষবাচক সর্বনাম দিয়ে উদ্দেশ্য নারী- পুরুষ উভয়েই। এর মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই।

রেশমি : তাহলে বিষয়টা এমন?

নুসাইবা : হুম।

রেশমি : ওহ।

নুসাইবা : রেশমি, আমরা মানুষ অনেক বেশি যুক্তিবাদী। আমাদের যুক্তির কোনো অভাব নেই। কিন্তু আমরা আমাদের যুক্তিগুলো ব্যবহার করি আমাদের সুবিধার স্থানে। যেখানে যুক্তির মাধ্যমে কাজ হাসিল হয়—তার জন্য ব্যবহার করি।

---

[২৬] যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে এটা নিয়ে—যা আমি আমার বান্দার ওপর ধাপে ধাপে অবতীর্ণ করেছি। তাহলে এর ধারেকাছে একটি সুরা তৈরি করো এবং আল্লাহ ছাড়া যেকোনো সাক্ষীকে ডাকো; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। [সুরা বাকারা, ২২]

[২৭] সুরা আলে ইমরান : ১৯৬।

যদি প্রমাণ হয় স্রষ্টা নেই বা স্রষ্টা নারীবিদ্বেষী তাহলে মানবতার কথা বলে সকলকে স্রষ্টা থেকে দূরে আনা যাবে। তখন দেখা যাবে নামাজ-রোজা-হজ-জাকাতের কোনো প্রয়োজন পড়বে না। আমাদের টাকাও বেঁচে গেল; কষ্টও হলো না। তাই আমরা আমাদের যুক্তিগুলো এভাবেই ব্যবহার করি।

কিন্তু তুই যদি প্রশ্নগুলো ভালোভাবে খতিয়ে দেখিস। কুরআনকে গবেষণা করে পড়িস; তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবি তুই ভুলের মধ্যে আছিস। কুরআন এবং হাদিস সবসময়ই নারীদের সম্মান দিয়েছে। তুই একনিষ্ঠভাবে গবেষণা কর, তাহলেই বুঝে যাবি। বুঝে যাবি সত্যিই ইসলাম নারীদের সর্বোচ্চ অধিকার, সম্মান দিয়েছে।

রেশমি : আচ্ছা নুসাইবা চল, এখন বাসায় ফেরা যাক।
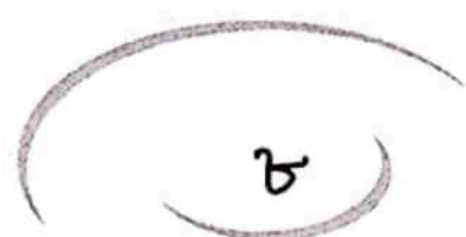
উত্তরাধিকার প্রশ্নে নারীর প্রাপ্য

নুসাইবা মায়ের সাথে বসে আছে। সাধারণত মায়ের সাথে সময় দিতে পারত না সে। মায়ের থেকে যত দূরে থাকতে পারত ততোই মঙ্গলজনক ভাবত। সামনে পেলেই এটা-ওটা বলতে থাকে। বোঝাতে থাকে। নুসাইবার এসব বিরক্তিকর ঠেকে। তাই দূরে দূরেই থাকত সবসময়। কিন্তু আজ কেন জানি মায়ের পাশে বসতে ইচ্ছে হচ্ছে। কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। মা সেই ছোট্ট থেকেই চেয়েছে মেয়েটাকে নিজের মতো বানাতে, কিন্তু পারেননি। নুসাইবার বাবাকেও ছেড়ে যেতে পারেনি। এভাবেই কাটিয়ে দিয়েছে জীবনের প্রায় পুরোটা সময়।

নুসাইবা বড় হয়েছে। আশা ছিল বড় হলে যদি কিছু বোঝে। কিন্তু সে আশায়ও গুড়েবালি। সেও হয়েছে বাবার মতোই। কষ্টের পাল্লাটা আরও ভারী হয়ে গিয়েছিল মায়ের। কিন্তু আজ হঠাৎ নুসাইবার পরিবর্তনে মা ভীষণরকম আনন্দিত হয়েছে। এমন আনন্দিত তিনি ইতঃপূর্বে কখনো হয়েছেন কি না—স্মরণ নেই। তবে আজকের আনন্দটা ভিন্নরকম। নুসাইবা মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। হঠাৎ এককোঁটা তপ্তাশ্রু নুসাইবার গালে টপ করে পড়ল। নুসাইবা চোখ খুলে আবার বন্ধ করে নিল। সাথে মাকে আরেকটু কাছে টেনে নিল।

নুসাইবার মামা বোনের ওয়ারিসসূত্রে পাওয়া জমির কাগজপত্র পাঠিয়েছে। কিন্তু সেটা নুসাইবার বাবার খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না। কারণ—যা পেয়েছে তা ছিল নুসাইবার মামার অর্ধেক। তাই তিনি যথেষ্ট রাগান্বিত। তার সাথে যোগ হয়েছে নুসাইবার বোরকা পরে ভার্সিটিতে যাওয়া। সবমিলিয়ে পরিপক্ব রাগান্বিত। আর তার রাগ উঠলে মুখ দিয়ে যে কী বের হয়—তিনি নিজেও জানেন না।

বাবা : আচ্ছা তোমার ভাই তোমাকে তার অর্ধেক সম্পত্তি দিল কেন?

মা : মুসলিম আইন অনুযায়ী তো তাই দেওয়া হয়। অনেকের ভাইয়েরা বোনদের তো কানাকড়িও দেয় না।

বাবা : রাখো তোমার মুসলিম আইন। আর তুমিও কেমন পড়ে আছ সেই চৌদ্দশ' বছরের পুরোনো আইন নিয়ে। দেখো দুনিয়া কত এগিয়ে গিয়েছে। আর তুমি সেই পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী অর্ধেক সম্পত্তি পেয়েই খুশি।

মা : আমি মুসলিম। ইসলামের রীতি সবসময়ই আমার জন্য অপরিহার্য—পুরাতন বা নতুনে কিছু যায় আসে না। আর ইসলামের সকল বিধানই মানুষের জন্য উপকারী। সবসময়ই ন্যায্য।

বাবা : ভাইয়ের অর্ধেক বোনকে দেওয়া—এটা খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে জুলুম। আবার তুমি বলছ সবসময়ই ন্যায্য। হাস্যকর। এ-ই তোমার ধর্ম?

নুসাইবা : খালি চোখে দেখছ বলেই বুঝতে পারছ না এটাই সঠিক। আচ্ছা বাবা, তুমি তো বিয়ে করেছ এই শর্তে—আম্মুর ভরণপোষণের সব দায়িত্ব তোমার। যতো প্রয়োজন, তুমি মেটাবে। কিন্তু তুমি এখন মায়ের সম্পত্তি নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

নুসাইবা আস্তে আস্তে কথাগুলো বলল।

বাবা : এই বেয়াদব মেয়ে, তুই কেন কথা বলছিস? বড়দের মাঝে কথা বলার সাহস কোথায় পাস? পড়ালেখা করে বেয়াদবি শিখছিস? ধর্মের নামে এসব ভণ্ডামির কথা না বলে—নিজেও ভণ্ডামি শুরু করেছিস। নির্বোধ মেয়ে কোথাকার!

নুসাইবা : বাবা দেখো—ইসলাম নারীদের জন্য একটা নিয়ম করে দিয়েছে। যাতে তারা এবং তাদের পরিবার সুখী হয়।

নারী যখন মেয়ে তখন তার সকল চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব বাবার। যদি বাবা না থাকে তাহলে বড়ভাইয়ের। বড়ভাই না থাকলে চাচা, দাদাদের। কাউকে না কাউকে দায়িত্বশীল করে দেওয়া হয়েছে। তেমনই নারী যদি স্ত্রী হয়; তখন তার সকল দায়িত্ব বর্তায় তার স্বামীর ওপর। স্বামী মারা গেলে ছেলের ওপর। ছেলে না থাকলে শ্বশুর-শাশুড়ির ওপর।

এভাবে নারীর নিজস্ব অর্থ-সম্পদ খরচ করার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। যেমন আম্মুর সকল দায়িত্ব এখন তোমার ওপর। আম্মুর নিজ খরচের কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে আম্মু সম্পদ দিয়ে কী করবে? তারপরও যেকোনো বিপদে আম্মু যেন নিজের ব্যবস্থা নিতে পারে। সেজন্য আল্লাহ তাআলা নারীর উত্তরাধিকার দিয়েছেন।

বাবা : তুই যে বললি—বাবা, ভাই, স্বামী নারীর খরচ বহন করবে। যদি তাদের কেউ-ই না থাকে; তখন একজন নারীর বেঁচে থাকার ব্যবস্থা কে করবে? প্রয়োজন পূরণ কে করবে?

নুসাইবা : বাবা ধরো, আমি সেই অবস্থায় পড়লাম। আমাকে দেখার মতো কেউ-ই নেই। সুতরাং তোমার সম্পত্তির কোনো উত্তরাধিকারও নেই—আমি ছাড়া। তখন তোমার সকল সম্পত্তিই আমার হবে। আমি ছাড়া তো আর কোনো উত্তরসূরিই নেই। আর তাই তোমার সকল সম্পত্তিই আমার। তখন তো আর সমস্যা নেই।

একজন নারী কীভাবে থাকবে, কেমন থাকবে—সকল কিছুই আল্লাহ তাআলা ঠিক করে দিয়েছেন। এবং স্রষ্টা হিসেবে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। জানেন কীসের মধ্যে কার সুখ। তাই সেকেলে, পুরোনো, এসব বলে সঠিক বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না—কারোর জন্যেই। বরং সেটাকে আরও আঁকড়ে ধরা প্রয়োজন। কারণ তাতেই কল্যাণ। তাই সেকেলে বলে ইসলামের বিধানকে পরিহার করা একরকম অজ্ঞতা।

বাবা : তুই তো দেখি অতিরিক্ত বেয়াদব হয়ে গেছিস। যা এখান থেকে। না হয়...

নুসাইবা : বাবা, তুমি আমাকে বকছ। আমি শুনছি। কারণ এখন কথা বললে—এটা আমাদের সম্পর্ক নষ্টের কারণ হবে। এজন্য ইসলাম একজনকে প্রাধান্য দিয়ে, পরিবারের সকলের দায়িত্ব তাকে অর্পণ করেছেন। অন্যদেরকে আনুগত্য করতে বলেছেন। যাতে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সুখে থাকতে পারে। আর তোমরা এটাকেই নারীর অধিকার হরণ বলে চালিয়ে দিচ্ছ। এটাই তোমাদের আধুনিক মানসিকতা!

আর দেখো, এই যে পরিবারের এতো বড় দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হয়েছে। এটার জন্য তোমার অবশ্যই টাকা-পয়সার প্রয়োজন আছে। যেটা তোমার বোনের নেই। সেজন্য আল্লাহ তোমাকে বেশি নিতে এবং বোনকে অর্ধেক দিতে বলেছেন। এটা তো কোনোভাবেই অন্যায় মনে হচ্ছে না। তুমি আমাকে ব্যাখ্যা করবে—কীভাবে এটা জুলুম হলো?

বাবা : তুই যা এখন, না হয়... ধুর...

নুসাইবার বাবা নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মহর কি বিয়ে ঠেকানোর জন্য?
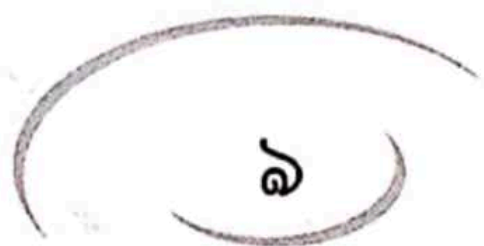
নুসাইবার বাবার এমন প্রচণ্ড রাগ মাঝেমধ্যেই ওঠে। কিন্তু আজ বেশি ভয়ানক। মেয়েটার মুখ এতো বেড়েছে! এসব শিখিয়েছিলাম আমি! ওর মাথাটার যে কী হলো! নিশ্চিত কারও পাল্লায় পড়ে এমন হয়েছে। আর, একবার যার মাথায় এই ভূত চাপে—সে ভূত নামানো অসম্ভব হয়ে যায়। নুসাইবার বাবার সহকর্মী ছিল অনেকেই। পরবর্তী সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এই আস্তিকতার রোগ সহজেই ছাড়ে না। আর যখন নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়—তখন তো এ বিষয়ে কথা বলা, সময় নষ্টের মতো।

আর নুসাইবাও সে রোগে আক্রান্ত। নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়েছে। ভালো ভবিষ্যৎ ছিল মেয়েটার। সব নষ্ট করে দিয়েছে। কথাবার্তার যে অবস্থা—মনে হয় না কখনো ফিরবে। তবে তিনিও থেমে থাকার পাত্র নন। এসব যুক্তি যুক্তি খেলায় তিনি পুরোনো প্লেয়ার। কতোজনকেই কুপোকাত করেছেন একজীবনে—তারই-বা হিসেব কে রেখেছে! আর এ তো নিজেরই মেয়ে। কিন্তু এসব কথা এল কোত্থেকে এই মেয়ের মাথায়?

নুসাইবার মা স্বামীর ঘরে গেলেন। পিছনে নুসাইবাও। মা পাশে বসে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। বাবা রেগে বললেন—

বাবা : এতো কষ্ট করে পড়ালেখা শেখাচ্ছি এমন বেয়াদবি করার জন্য?

মা : বুঝতে পারেনি। ছোট তো। তাই বলে রাগ করতে হবে?

বাবা : ও যে এসব ধর্ম-টর্ম নিয়ে এতো কথা বলছে, ও কি জানে ধর্ম নারীকে কতোটা অসম্মান করেছে?

নুসাইবা : বাবা, অন্য ধর্ম নারীকে অসম্মান করলেও ইসলাম নারীকে কোনো অসম্মানই করেনি। বরং তাদের প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে।

নুসাইবা কিছুটা কঠিনস্বরে কথাগুলো বলল।

বাবা : তুই আমার মেয়ে। তোর সামনে সবকিছু বলা সহজ না। কিন্তু মনে হচ্ছে বলা দরকার। তোর ধর্ম তো মাত্র কয়েক মহরের বিনিময়ে নারীকে বিক্রি করে দেয়।

বলা হয়েছে : 'মহর আদায় করা তোমাদের অধিক কর্তব্য এজন্য যে—এর মাধ্যমেই তোমাদেরকে স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গ ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।'[২৮] এই তোদের ধর্ম?

নুসাইবা : বাবা, তুমি যে মাকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছ—এর বিনিময়ে কি কিছু দিয়েছ?

বাবা : আমি আবার কী দেব?

াইবা : আমার জানামতে তুমি যৌতুক হিসেবে কিছু নিয়েছও। ওটা আমার বলার .য় না। যদি তুমি মহর আদায় না করো, ইসলাম তোমাকে অনুমতি দেবে না লনের। তবে মায়ের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকলে—ভিন্ন কথা। বাবা দেখো, একজন নারীকে মহর দেওয়ার মাধ্যমে তার সাথে স্ত্রীসুলভ ব্যবহার শুদ্ধ হয়। যদি বিষয়টা এমন হয় একজন নারীকে একজন পুরুষ বিয়ে করে নিয়ে এল, আর হয়ে গেল। তাহলে স্ত্রীর কোনো সম্মান বা মূল্যই থাকবে না। চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টেনে দিবে।

এভাবে দেখা যাবে নিত্যদিন নতুনত্বের জন্য বিয়ে করবে আর ছেড়ে দিবে। এমন হলে নারীর সম্মান কি বাড়ত? না, বরং আরও কমত। আসলে বাবা যা সহজে পাওয়া যায়—সহজে ত্যাগও করা যায়। আর দেখো, একজন নারীকে গ্রহণ করতে হলে তাকে মহর প্রদান করতে হবে, এটা কি শুধুই নারীর সম্মানের জন্য নয়?

আরেকটা জিনিস দেখো, আমরা পার্কে ঢোকার জন্য টিকিট কাটি। টিকিট ছাড়া প্রবেশের অনুমতি নেই। তাহলে টাকার বিনিময়ে তুমি প্রবেশাধিকার পাচ্ছ। কিন্তু এই অধিকার পাওয়া মানে এটা নয়—যা ইচ্ছা করে বেড়াবে পার্কের ভেতর। পার্কের ভেতর লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ তোমাকে একশ টাকায় তো আর দিয়ে দিচ্ছে না। স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার অনুমতি পাওয়া মানে এই না—তুমি কিনে ফেলেছ। বরং তুমি একজন নারীকে তার ইচ্ছায় তোমার জীবনের সাথে মিলিয়ে নিয়েছ, এবং তার সম্মানার্থে একটি বিধি মেনে নিচ্ছ—হোক সেটা তোমার আর্থিক ক্ষতি। অর্থাৎ তুমি তার প্রতি আগ্রহী বোঝাচ্ছ।

বাবা : কয়জন দেয়? তুই দেখেছিস দিতে?

---

[২৮] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৭৭৪, ইসলামি ফাউন্ডেশন।

নুসাইবা : বাবা, কেউ যদি বলে আমি মহর দিব না, তাহলে ইসলাম অনুযায়ী তাদের বিয়ে হবে না। কারণ মহরকে বিয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যেমন বলা হয়েছে : 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও!'[৩৯] এই আয়াতের একটি সূক্ষ্ম বিষয় কী জানো, আদায় করার অর্থে এখানে 'নিহলাহ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ হয় 'অতি সম্মানের সাথে আদায় করো!' এটাকে জোরপূর্বক বা মামলা করে আদায় করতে হবে কেন, বরং সম্মানের সাথে আদায় করে নাও!

বাবা : আসলে এই মহরের কারণ কী জানিস? যাতে মহরের টাকা আদায়ের ভয়ে পুরুষরা নারীদের তালাক না দেয়। তা ছাড়া আর কিছুই না।

নুসাইবা : এটাও তোমার ভুল ধারণা। যেমন সুরা নিসার সেই চার নম্বর আয়াতেই বলা হয়েছে : 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মহর আদায় করে দাও! তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ তোমাদের দেয়—তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো!' এখানে বলা হয়েছে মহর আগে আদায় করার জন্য। তালাকের সময় আদায় করার জন্য নয়।

আরেকটা বিষয় হলো ইসলামে মহরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বনিম্ন দশ দিরহাম।[৪০] এর ওপর যার যতো সামর্থ্য সে অনুযায়ী দিবে। কারও সামর্থ্য তিন লক্ষ টাকাও হতে পারে; আবার ত্রিশ হাজার টাকাও হতে পারে। সে অনুযায়ী আদায় করবে।

সামর্থ্য অনুযায়ী আদায় করলে—যদি এমন পরিস্থিতি সামনে আসে, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া লাগবে। তখন স্ত্রীকে মহরের জন্য, স্বামীকে আদায়ের জন্য কঠিন কিছুর সম্মুখীন হতে হবে না। বরং তারা তাদের ইচ্ছেমতো পৃথক হতে পারবে। টাকার দায়ে আটকে থাকতে হবে না। সেজন্যই এই পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেখা যায় তালাক না হয়ে পৃথক হয়ে গেলে মহরের বিষয়ে ঝামেলা থাকলে মামলা করে বসে মেয়েপক্ষ—যদিও তখনো তালাক হয়ইনি। তখন আর সম্পর্কটা ঠিক হওয়ার বিন্দুমাত্র আশা থাকে না।

---

[৩৯] সুরা নিসা : ০৪।

[৪০] ১০ দিরহামের কম কোনো মোহর নেই। বাইহাকি, হাদিস নং : ৭/২৪০।
দশ দিরহাম= ৩০ গ্রাম ৬১৮ মিলিগ্রাম রুপা। সেটার পরিমাণ যে যুগে যেমন হয়। যেমন : বর্তমান বাজার মূল্যে ২৫০০ টাকার আশপাশ।

কিন্তু মহরের বিষয় ক্লিয়ার থাকলে মামলা করতে পারে না। তদস্থলে ভাবার সুযোগ পায়। এমন হলে সম্পর্ক আবার ঠিক হওয়ার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়। অর্থাৎ—এটাই উত্তম।

সুতরাং এটা বলার কোনো সুযোগ নেই তালাকের ভয়ে মহর আদায় করার কথা বলা হয়েছে। বরং নারীর অধিকার যেন স্থায়ী হয়, স্বামী যে স্ত্রীর প্রতি আগ্রহী—বোঝা যায়, তার প্রাপ্য যেন সে পুরোপুরি পায়, কিংবা জরুরি কোনো বিপদে তার নিজস্ব অর্থে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারে—এজন্যই মহরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা কোনোভাবেই নারীর প্রতি অবিচার নয়, বরং সম্মাননা।

নুসাইবা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাবা-মা তাকিয়ে রইল। একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বাবা খেয়াল করল—মেয়েটা বেশ বড় হয়ে গেছে।

◆◆◆

নারীর কি ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই?

নুসাইবার মা স্বামীকে অনেককিছু বলে ঠান্ডা করলেন। নুসাইবার ঘাড়ে যদিও দোষ চাপাতে হলো। তবুও কোনোভাবে ঠান্ডা তো করা গেল! তবে আজ তিনি খুব একটা মুখখারাপ করেননি। গালমন্দও করেননি। তবে অনেক বেশি রাগান্বিত হয়েছেন। নুসাইবার মা মাঝেমধ্যে কী করবেন বুঝতে পারেন না। তবে আল্লাহ ভরসা। মেয়ে বুঝতে শিখেছে। সিরাতুল মুসতাকিম চিনেছে। চিনেছে নিজ সত্তাকে। স্বামীও হয়তো একসময় চিনে যাবে—ক্ষীণ একটা আশা উঁকি দেয় মায়ের মনে।

বাবাকে শুইয়ে দিয়ে নুসাইবার ঘরে এলেন মা। নুসাইবা ঘরে এসে বই পড়ছিল। মা পাশে বসলেন। নুসাইবা হাত থেকে বইটা টেবিলে রেখে মুচকি হেসে অভিনন্দন জানাল। মা মুচকি হাসির জবাব হাসিতে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে নরম গলায় বললেন—

মা : নুসাইবা, আমি ছোটবেলা থেকেই তোর নানা-নানিকে দেখেছি তারা নামাজ পড়ত, রোজা রাখত। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করত। তাদের সাথে আমিও করতাম। তখন থেকেই আমি ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু তোর বাবার পরিবারে আসার পর তোর বাবা আমাকে ধর্মের বিষয়ে বোঝাতে শুরু করে। ধর্ম নারীকে এই অসম্মান করেছে, ওই অসম্মান করেছে, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেয়নি, দাসী বানিয়েছে, এই সেই আরও অনেককিছু।

তোর বাবা একদিন বলেছিল—বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম নাকি নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো তোয়াক্কাই করে না। বরং বিয়ে দেওয়ার দ্বারা নারীকে পুরুষের যৌনদাসী করা দেয়। কোনোকিছুতেই তাদের কোনো মত দেওয়ার স্থান থাকে না। আসলেই কি ইসলাম এমন কিছু করেছে?

নুসাইবা : মা শোনো, রাসুলপূর্বযুগে আরবে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো—বিয়েতে মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো পরোয়াই করা হতো না। বরং মেয়ের মা-বাবা যার সাথে চাইত তার সাথে বিয়েতে বাধ্য হওয়া লাগত। আবার বিয়ে হলেও নির্দিষ্ট পরিমাণ মহর তা মেয়েকে দেওয়া হতো না। বরং তার পরিবারই নিয়ে নিত। বলা চলে মেয়েকে বিক্রি করে দিত। এরপর আর মেয়ের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছার জায়গা থাকত না। এটা ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বচিত্র।

কিন্তু দেখো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন : হুজুর, বিয়ের বিষয়ে কি আমাদের কন্যাদের থেকে অনুমতি নিতে হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, নিতে হবে।

অন্য একজায়গায় বলা হয়েছে—আবু বকর বিন আবু শাইবা, ইসহাক বিন ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ বিন রাফি রহিমাহুমুল্লাহুম বর্ণনা করেন, আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম—যে মেয়েকে তার অভিভাবক বিয়ে দেয়, তার নিকট থেকেও সম্মতি নিতে হবে কি না? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হ্যাঁ, তার সম্মতিও নিতে হবে। আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আমি তাকে পুনর্বার বললাম—সে তো লজ্জায় পড়বে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তার নীরবতাই তার সম্মতি।[৩১]

এ ছাড়াও মুসলিম শরিফের ৩৩৬৬ নম্বর হাদিস থেকে ৩৩৬৮ নম্বর হাদিস পর্যন্ত এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

মা : হুম বুঝলাম। কিন্তু কুরআন কারিমের কোথায় যেন বলা হয়েছে নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষদের স্বস্তির জন্য। এবং পুরুষদের শস্যক্ষেত্র হিসেবে?

নুসাইবা : মা, এখানে যেহেতু দুটো বিষয় রয়েছে। প্রথমটা নারীদের সৃষ্টি পুরুষদের স্বস্তির জন্য। আরেকটা শস্যক্ষেত্র। তাহলে আগে স্বস্তির বিষয়টা আলোচনা করি। তারপর শস্যক্ষেত্রের বিষয়টা আলোচনা করব।

যেহেতু এটা বলতে গিয়ে একটি আয়াত আনা হয়, তাই কুরআন থেকেই জানা যাক সে আয়াতে মূলত কী বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে : 'তিনিই সে সত্তা, যিনি মাত্র একটি অস্তিত্ব থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। যাতে সে তার নিকট স্বস্তি পেতে পারে।'[৩২]

আমরা জানি হজরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। এবং তাকে জান্নাতে থাকতে দিয়েছেন। তিনি সেখানে যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন। যা ইচ্ছা খেতে, পরতে পারতেন। কিন্তু সেখানে তিনি একাকিত্ব বোধ করতেন। কিন্তু দেখো, তখন পর্যন্ত তিনি অন্য কারও সঙ্গই তো লাভ করেননি। অথচ একাকিত্ব ঠিকই অনুভব করতেন। অর্থাৎ পুরুষ বা নারী একজন অন্যজন ছাড়া একাকীই।

---

[৩১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৩৩৬৬।

[৩২] সুরা আরাফ : ১৮৯।

আল্লাহ তাআলা তার একাকিত্ব গুছানোর জন্য মাতা হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন। এবং একজনকে আরেকজনের অর্ধাঙ্গ হিসেবে অবহিত করলেন। একাকিত্ব দূর করলেন। স্বস্তি দিলেন।

এখন তুমিই বলো—কেউ যদি কারও জন্য একাকিত্ব বোধ করে। তার জন্য মন ব্যাকুল থাকে। তাকে পাওয়ার পর স্বস্তিবোধ করে। তাহলে কি তুমি এটাকে অন্যায় বলবে? বা অবিচার?

মা : না।

নুসাইবা : এটা ছাড়াও দেখো, দুইজনের একত্রীকরণে যে স্বস্তি পায়, তা কেবলই কি পুরুষের জন্য? আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, যাতে পুরুষ এবং নারী উভয়েই উভয় থেকে নিজেদের স্বস্তি খুঁজে নিতে পারে। এখানে শুধু উদ্দেশ্য এমন নয়—পুরুষ নারীকে শুধু ভোগই করে যাবে। বরং এমন হতে হবে স্ত্রীর অঙ্গে আঘাত মানে স্বামীর অঙ্গে আঘাত। স্ত্রীকে কটু কথা বলা মানে স্বামীকে বলা। স্ত্রীর সম্মানই স্বামীর সম্মান—স্বামীর সম্মানই স্ত্রীর।

মা : এটা বুঝলাম। কিন্তু নারীকে শস্যক্ষেত্র বলা হলো সে বিষয়ে কী বলবি?

নারীকে কি শস্যক্ষেত্র বলা হলো?
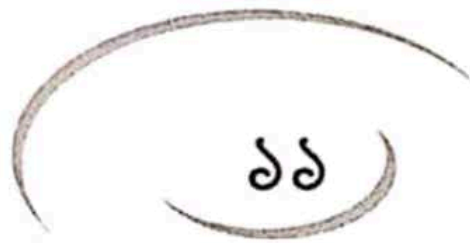
নুসাইবা : মা, তুমি জানো কুরআন নাজিল হয়েছে একটু একটু করে। প্রত্যেকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এককেটি ঘটনা সংঘটিত হওয়াকে কেন্দ্র করে। এ সমস্ত ঘটনাগুলোকে বলা হয় শানে নুজুল বা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। সুতরাং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ারও নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে।

আয়াতটির বিষয়ে আলোচনার পূর্বে অবশ্যই সেই কারটি জেনে নেওয়া উচিত। তাতে এই আয়াতের আলোচনা বা ব্যাখ্যা বুঝতে সহজ হবে। আর এই আয়াতের শানে নুজুল এমন :

হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, ইহুদিরা বলত—মহিলাদের উপুড় করে সহবাস করলে ট্যারা সন্তান জন্মায়।

হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, কেন, কী করেছ? তিনি বললেন—রাতে আমার বাহনকে উলটো করে দিয়েছি। এটা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বললেন না। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হলো।[৩৩]

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে মুমিনদের জানিয়ে দেওয়া হলো—ইহুদিদের ট্যারা সন্তান জন্মানোর এই ধারণা একটি কুসংস্কার মাত্র। বাস্তবতার সাথে এর কোনোই মিল নেই। সুতরাং তোমরা যেভাবেই মিলিত হও—ট্যারা সন্তান হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

তাহলে দেখা গেল, একজন কৃষক যেভাবে তার ইচ্ছেমতো শস্যক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন করতে পারে। চাই লম্বালম্বি চাষ করুক বা বাঁকা করে করুক! এমনইভাবে পুরুষ চায় উপুড় করে সহবাস করুক বা চিত করেই করুক! তার দ্বারা ট্যারা সন্তান হবে না। তবে আল্লাহর দেওয়া বিধান (সামনের রাস্তা) অনুযায়ী করতে বলা হয়েছে।

মেয়ের কথা শুনে নুসাইবার মা কিছুটা ইতস্ততবোধ করলেন। কিন্তু নুসাইবার কীই-বা করার আছে। তাকে বলতে হচ্ছে একান্তই অপারগ হয়ে। সবমিলিয়ে তিনি যেন বিষয়টি বুঝতে পারেন।

[৩৩] তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন।

নুসাইবা : আরেকটা বিষয় দেখো আম্মু, আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করো এবং আল্লাহকে ভয় করো।'[৫৪]

তার পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে : 'তোমরা স্ত্রীসহবাস করো না তাদের ঋতুস্রাব অবস্থায়।'

তারও আগের আয়াতে বলা হয়েছে : 'তোমরা মুশরিক নারী বিবাহ করো না, তারা তোমাদের মুগ্ধ করলেও।'

তাহলে স্পষ্ট, এখানে বলা হয়নি—তোমরা নারীকে যেভাবে ইচ্ছা ভোগ করতে পারো! বরং কীভাবে একজন নারীর যৌনজীবন হবে—তা বলা হয়েছে। এটা কোনোভাবেই নারীর প্রতি অনধিকার চর্চা হতে পারে না। আর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার জন্য যৌনবিষয়ক নীতিমালা উপস্থাপন করাও জরুরি। না হয় সেটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হতেই পারে না।

মা : তা মানলাম নুসাইবা। কিন্তু একজন নারীকে শস্যক্ষেত্র বলাটা কেমন উপযুক্ত?

নুসাইবা : আম্মু, এখানে কাউকে শস্যক্ষেত্র বলা হয়নি। বরং উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর যদি বলো শস্যক্ষেত্রের উদাহরণ কেন নারীর সাথে করা হলো—তাহলে তোমার সেই প্রশ্নের জবাবও আছে। আচ্ছা মা, তোমার বাবা কৃষক ছিলেন না?

মা : হ্যাঁ, ছিলেন। তো?

নুসাইবা : আম্মু, আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয় দেখাব। একজন কৃষকের মাঝে এই বিষয়গুলো থাকে কি না তুমি বলবে।

মা : আচ্ছা দেখা!

নুসাইবা : খেয়াল করো আম্মু—

ক. একজন কৃষকের ভাবনা একটি বিষয় নিয়েই থাকে—সেটা তার শস্যক্ষেত্র।

---

[৫৪] সুরা বাকারা : ২২৩।

খ. সে চায়, তার শস্যক্ষেত্রে অন্য কেউ ভাগ না বসাক! অন্য কেউ তা দখল না করুক!

গ. তার বড় চাওয়া থাকে, শস্যক্ষেত্র সবসময় নিরাপদ, সকলের চেয়ে ভালো, এবং সুনিপুণ হোক।

ঘ. কৃষক তার শস্যক্ষেত্রে হাল দেয়, আগাছা পরিষ্কার করে, শস্য বপন করে। মোটকথা শস্যক্ষেত্রই তার কাছে মূল চিন্তার বিষয় হয়।

মা তুমিই বলো এই গুণগুলো কি একজন কৃষকের মাঝে থাকে?

মা : হ্যাঁ, থাকে।

নুসাইবা : এখন মেলাও—একজন স্বামীর জন্য উচিত নয় কি, তার সকল ভাবনায় তার স্ত্রী থাকা! তার এই অতুল্য সম্পদকে অন্যের হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা! তাকে নিয়েই তার ভাবনা থাকা! এবং সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখা?

মা : হুম। অবশ্যই।

নুসাইবা : ঠিক তেমনই, আল্লাহ তাআলা এখানে শস্যক্ষেত্র দিয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। উদাহরণ দিয়েছেন—তোমরা কীভাবে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে, এবং তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের নিকট কতোটা মূল্যবান—এটা শিক্ষা দেওয়া কি কখনো নারীর অধিকার হরণ হতে পারে?

মা : নুসাইবা, আল্লাহ তোকে বাঁচিয়ে রাখুক!

নুসাইবা : আমিন আম্মু। তোমাকেও।

মা : আচ্ছা এখন ঘুমিয়ে পড়!

◆◆◆

ইসলাম কি বিধবা বিবাহে অনুৎসাহিত করে?

সালমা একজন প্রগতিশীল নারীবাদী লেখিকা। নুসাইবার সহপাঠী। একই স্টেজে অনেকটা সময় কাটিয়েছে তারা। সালমার মনোভাব সম্পর্কে জানা আছে নুসাইবার। সালমা ওপরে ওপরে নুসাইবার আস্তিক হয়ে যাওয়ায় কষ্ট পেয়েছে দেখালেও— ভেতর ভেতর আনন্দিতই হয়েছে। আগে যেকোনো প্রোগ্রামে নুসাইবাকে ডাকা হতো। এখন ডাক পড়ে সালমার। নেতানেত্রীদের সাথে ভালো মেলামেশা হয়। আস্তে আস্তে স্তর উন্নীত হওয়ার পথ যাকে বলে।

নুসাইবার সাথে সালমার অনেক কথা হয়। যেকোনো বিষয়েই। সে ক্ষেত্রে সালমা নুসাইবার আগের দেওয়া যুক্তি, প্রমাণগুলোই নুসাইবার সামনে তুলে ধরে। যুক্তি দেখায়। নুসাইবাকে হারাতে চায়। আজও এর অন্যথা হলো না। হঠাৎ লেগে গেল বিধবা বিয়ে নিয়ে। নুসাইবা ইসলামের দৃষ্টিতে বিধবা বিয়ের বিষয়ে বলতে শুরু করল–

নুসাইবা : একসময় বিধবা নারীদের মনে করা হতো সমাজের বোঝা। পিতার অস্বস্তির কারণ। উঠতে-বসতে তাদের হতে হতো অপমানিত, অপদস্থ। সমাজের বিচ্ছিন্নতায় ছিল তাদের বসবাস। যদি একান্তই কেউ বিধবা বিয়ে করত তখন তার কারণ হতো বউকে দাসী বানানো। ভোগ করা। মেয়ের পরিবার জানত এমন কিছুই হবে। জেনেও তারা বিয়ে দিত। কলঙ্ক দূর করার জন্য। যে কারণে বিধবা স্ত্রীরা হতো লাঞ্ছিত, অপদস্থ।

সে যুগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হতো আল-আমিন। তিনি ছিলেন সবার বিশ্বস্ত। সকল পুরুষই ছিল তার ভক্ত। সকল নারীর প্রথম পছন্দ ছিলেন তিনি। যেমন ছিল তার সৌন্দর্য, তেমনই ছিল তার মহৎ গুণ এবং ব্যবহার। প্রথম দর্শনেই দুশমন বন্ধু হয়ে যেত।

তখনকার সময়ে মক্কায় খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা ছিলেন একজন নামকরা ব্যবসায়ী। তার ব্যবসা আরব ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন বিধবা। বয়স ছিল চল্লিশোর্ধ্ব। তিনি তার এক বান্ধবীর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। সে প্রস্তাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজি হোন এবং তাদের বিয়ে হয়ে যায়। খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি অন্য কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেননি। এবং মৃত্যুর পরও তিনি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

সালমা : বিষয়টা তো এমন ছিল—খাদিজা বিত্তশালী ছিলেন। প্রচুর অর্থকড়ি ছিল। এই অর্থের লোভে মুহাম্মাদ খাদিজাকে বিয়ে করেছিল। তাই নয় কি?

নুসাইবা : এটা শুধু তোদের দাবি ছাড়া কিছুই না। এ পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক দেখাতে পারেননি—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন। পায়ের ওপর পা তুলে খেয়েছেন। যেভাবে ইচ্ছা আনন্দ, উৎসব করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না খাদিজার অর্থে জীবনযাপন করেছেন, না মৃত্যুর পর তা থেকে স্বামী হিসেবে কিছু নিয়েছেন। বরং খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা তার সমস্ত সম্পদ তার জীবদ্দশাতেই দান, সদকা করে দিয়েছেন। তাহলে কীভাবে বলবি শুধু অর্থের লোভেই তিনি খাদিজাকে বিয়ে করেছিলেন?

সালমা : এক হাদিসে তো তোদের রাসুল এক সাহাবিকে কুমারী বিয়ে না করে বিধবা বিয়ে করায় ভর্ৎসনা করেছেন। এর মাধ্যমেই কি উৎসাহ দিয়েছেন বিধবা বিয়ে করার?

নুসাইবা : তোকে সেই হাদিসটি বিস্তারিত শোনাই : 'আবদুল্লাহ বিন জাবের রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা যখন মদিনার নিকটবর্তী হলাম, আমি আমার বাড়ির দিকে রওয়ানা করলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, আমি একজন বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী কেন বিয়ে করলে না? তুমি তার সাথে খেলা করতে, সে তোমার সাথে খেলা করত! আমি বললাম, আমার আব্বা মারা গিয়েছেন এবং কয়েকজন কন্যা রেখে গিয়েছেন। আমি চাইলাম এমন একজন মেয়েকে বিয়ে করতে—যে হবে অভিজ্ঞতাসম্পন্না এবং বিধবা। তিনি বললেন, তাহলে ঠিকাছে।[৩২]

দেখ সালমা, একজন যুবকের জন্য তো যুবতীই মানানসই। কোনো যুবক কি বিধবা বিয়ে করতে চায়? আর কোন যুবতীই-বা চায় বৃদ্ধ ব্যক্তির স্ত্রী হতে। তুই চাইলে চাইতে পারিস; এটা তোর বিষয়।

সালমা : পাগল নাকি?

নুসাইবা : সালমা, সেই সাহাবি যখন বললেন বিধবা বিয়ে করেছে—তখন তিনি তার কারণ জানতে চেয়েছেন। এটার কারণ হলো তিনি চেয়েছেন, তাদের দাম্পত্যজীবন দীর্ঘ হোক। আনন্দময় হোক।

---

[৩২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ২৩০৯।

যখন সাহাবি বললেন এ কারণে, তখন তিনি বললেন—ঠিকাছে। এমন তো না তিনি বলেছেন, এরকম করো না। এটা অন্যায়। এমন করা উচিত হয়নি। বরং তাকে উত্তম পন্থা দেখানোর জন্য বলেছেন। এটা নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ নয়, বা এটাকে ভর্ৎসনাও বলা যায় না।

সালমা : আচ্ছা নুসাইবা, তুই কি এরকম কোথাও দেখাতে পারবি যেখানে ইসলাম বিধবা বিবাহে উৎসাহ দিয়েছে?

নুসাইবা : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই শুধু একজন স্ত্রী ছাড়া সকল বিয়ে করেছেন বিধবা। ইসলামের প্রধান চার খলিফাও বিধবা বিয়ে করেছেন। এবং একজায়গায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিধবা এবং মিসকিনের জন্য খাদ্যজোগাড়ে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মতো, অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান এবং দিনে সিয়ামকারীর মতো।[৩৬]

তাহলে ভাব, তাদের বিয়ে করা কতো ফজিলতপূর্ণ! ইসলাম যেমন বিধবা নারীকে বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। তেমনই তাদের দেখাশোনা করার ফজিলতও বর্ণনা করেছে।

সালমা : বিধবা বিয়ের যদি এতোই ফজিলত হবে, তবে কেন নিজ স্ত্রীদের 'উম্মতের মা' বলে তাদেরকে বিয়ে করতে বাধা দিলেন? তিনিও তো নিজেকে 'বাবা' বলে কুমার থাকতে পারতেন। এটা করলেন না কেন?

নুসাইবা : সালমা, প্রথম কথা—যদি তিনি বিবাহ না করে কুমার থাকতেন, তাহলে উম্মতকে বিয়ে এবং যৌনবিষয়ক বিধিবিধান শেখাতে পারতেন না। তখন লোকেরা বলত—নিজের তো স্ত্রীই নেই, আসছে দাম্পত্যজীবন নিয়ে কথা বলতে।

দ্বিতীয়ত মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনের বিধিনিষেধ তাদের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হতো না। কারণ—অনেক বিধিনিষেধ এরকম আছে, যা মেয়েকে বলা সম্ভব নয়—স্ত্রী ব্যতীত। বা একজন পুরুষকেও স্পষ্টভাবে বোঝানো যায় না। সবমিলিয়ে তার জন্য বিবাহের প্রয়োজন ছিল উম্মতের নারীদের স্বার্থেই। আর তা ছাড়া তিনি একজন পুরুষও ছিলেন।

এখন বলবি স্ত্রীদের মা বলে দ্বিতীয় বিবাহে কেন বাধা দিলেন? সাধারণ মেয়ে হিসেবে তো তারাও দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারত।

---

[৩৬] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৯৮২।

সালমা ভাব—তোর বাবা তোর মাকে বিয়ে করেনি। তোর মায়ের সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। অন্য একজন নারী তোর মা। তোর বড়ভাই এখনকার যে তোর খালা আছে তাকে বিয়ে করল। তাতে কি কোনো সমস্যা আছে?

সালমা : না।

নুসাইবা : কিন্তু যখনই তিনি তোর বা তোর ভাইয়ের মা, তখন তিনি তোর ভাইয়ের খালা। সুতরাং তখন তাকে বিয়ে করা অসম্ভব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু মুসলিম জাতির কর্ণধার ছিলেন। তখন তার স্ত্রীগণ অনুসারীদের 'মা' হতেন।

সুতরাং তিনি বিয়ে করেছেন উম্মতের স্বার্থে। আর তাঁর স্ত্রীগণ বিধবা কাটিয়েছেন সম্মানার্থে। এখন তুইই বল মাকে কীভাবে...

সালমা : আচ্ছা নুসাইবা বাদ দে আজ। অনেক দেরি হয়ে গেল। বাসায় যাই। আবার কোনোদিন কথা হবে এ বিষয়ে।

সালমা, নুসাইবার আগেই ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

১৩
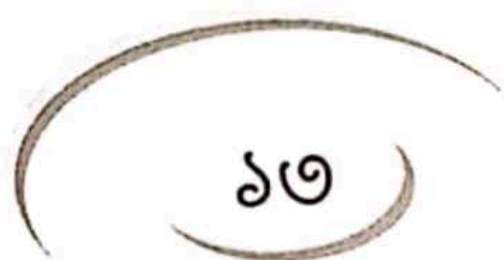
পিরিয়ড

নাস্তিকতার মূল প্রতিপাদ্য হলো হিউম্যান বিয়িং। মানবতাবাদ। আর সেই মানবতাবাদের একটি অংশবিশেষ নারীবাদ। এবং এই সবকিছু মিলিয়ে তৈরি পাশ্চাত্য সভ্যতার ধর্মহীন ধর্মবিশ্বাস। নারীবাদ এমন একটি অস্ত্র; যার মাধ্যমে নারীর অধিকারের নামে নাস্তিকতার আহ্বান করা যায়। টানা যায় ধর্মদ্রোহীতায়।

ফারজানা তাদেরই একজন। একসময় ধর্মের সকল বিধান পালন করত। বোরকা পরে ক্লাস করত। যেকোনো জায়গায় বোরকা পরেই যেত। কিন্তু নারীবাদের বুলি তাকে ভ্রষ্ট করেছে। ধর্মহীনতায় ছেয়ে গেছে জীবন। ইসলাম বা ধর্মের বিষয়ে কথা বলা তার সাথে বেমানান। এখন সে একজন নাস্তিক। নারীবাদী নাস্তিক। স্রষ্টাদ্রোহিতাই তার প্রথম কাজ। পরের কাজ ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ।

দুপুরে নামাজের বিরতিতে নুসাইবা-ফাইজা-রেশমি নামাজের জন্য নির্দিষ্টস্থানে যাচ্ছিল। ফারজানা বসেই ছিল। হয়তো কিছু ভাবছিল। বসে থাকতে দেখে নুসাইবা ওর কাছে গেল। নাস্তিক জানা সত্ত্বেও আগের কথা ভেবে বলল—

নুসাইবা : কীরে, নামাজ পড়বি না?

ফারজানা : নাহ, তুই গিয়ে পড়!

নুসাইবা : সমস্যা নাকি কোনো?

ফারজানা : আরে নাহ। তোদের ধর্মমতে যে সমস্যাকে নামাজের অন্তরায় করা হয়েছে, সে সমস্যা হয়নি।

নুসাইবা : তাহলে চল, নামাজটা পড়ে নিবি!

ফারজানা : আচ্ছা তুই বারবার নামাজের কথা বলছিস কেন? কার জন্য নামাজ পড়ব? সে স্রষ্টার জন্য—যিনি কিনা আমাদের নারীসমাজকে এই একটা সমস্যার কারণে অপবিত্র বলেছে; তার ইবাদত করব? আর তোরই-বা কী হলো, একসময় তো তুই নারীবাদের সবক দিতি আমাকে। এখন তুই-ই ওই ভ্রান্ত, ভ্রষ্টধর্মে বিশ্বাসী হয়ে গেলি?

নুসাইবা : ফারজানা, আমার ওই জায়গাটা থেকে ফিরে আসাটা সহজ ছিল না। আমার কাছেও মোটাদাগের যুক্তি ছিল। এ বিষয়ে তোর চেয়ে ভালো কে জানবে! তবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে সেখান থেকে বের করে ঠিকই নিয়ে এসেছে। এবং আজ এই অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

এখন আমি ইসলামের সকল বিধিনিষেধ বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। আর রয়ে গেল তোর সংশয়। সেটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। এখন চল নামাজটা পড়ে আসি!

ফারজানা : না, তুই এখনই বল!

নুসাইবা : ঠিক আছে শোন, প্রথমে একটা কথা বলে নিই, সবকিছু বিশ্লেষণ করে নেওয়া উচিত—বিভ্রান্তি ছড়ানোর পূর্বে। তুই যে কথাটা বলেছিস সে বিষয়ে কোরআনের আয়াত হলো : 'আর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করা হয় হায়েজ (পিরিয়ড) সম্পর্কে। বলে দিন এটি অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকো। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না—যতক্ষণ না তারা পাক হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে শুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন করো তাদের কাছে—যেমন তিনি আদেশ করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যে বেঁচে থাকে—তাকে পছন্দ করেন।'[৩৭]

ফারজানা : তুই-ই দেখ, এখানে কি নারীদের অপবিত্র বলা হলো না?

নুসাইবা : আচ্ছা ফারজানা, তোর পোশাকে যদি পেশাব লেগে থাকে—তাহলে কি তুই সেটাকে পবিত্র বলবি?

ফারজানা : না।

নুসাইবা : বলবি না। কারণ সেটা অপবিত্র। মানুষের রক্ত যা শরীর থেকে বের হয়, ইসলাম অনুযায়ী তাও অপবিত্র। বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে অজু ভেঙে যায়। শুধু মহিলাদের জন্য নয়, পুরুষদের জন্যও। আচ্ছা তুই এটার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য দেখছিস?

ফারজানা : না। এটা ইসলামে সবার জন্যই। কিন্তু এটার সাথে হায়েজের কী সম্পর্ক?

নুসাইবা : হায়েজের সময় যে রক্ত বের হয়, সে রক্ত আর সাধারণ রক্ত কি একই?
ফারজানা : না।

[৩৭] সুরা বাকারা : ২২২।

নুসাইবা : এটা বের হতেই থাকে। শরীরের সাথে লেগে থাকে। অর্থাৎ তোর অজুর প্রয়োজন, তা যদি সাধারণ নাপাকও হয়। কিন্তু এটা তোর গায়ের সাথে লেগেই আছে। বের হচ্ছেই। তুই পাক হবি কীভাবে বল?

বলবি রক্ত অনবরত পড়তে থাকলেও তো শুধু নামাজের সময় অজু করে নামাজ পড়া যায়। হায়েজের সময় কেন নয়? দেখ, সাধারণভাবেই আমরা জানি হায়েজ একটি কষ্টের বিষয়।

আল্লাহ তাআলা উপরোল্লেখিত আয়াতে 'অশুচি' বা 'অপবিত্র' যে শব্দ দিয়ে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তা হলো 'আযা'—যার শাব্দিক অর্থ কষ্ট। এই রক্ত বের হতেই থাকে। কখন বের হবে সেটাও অজানা। আর এটা এমন না যে একবার ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে।

বরং প্রতি মাসে এটা হতেই থাকবে। আর যে বিষয়ে অল্প সময়ের জন্য অজু করে নামাজ পড়ার কথা এসেছে তা ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া একটি সময়ের জন্য। এমন না এটা প্রতি মাসেই হয় বা বছরে। কিন্তু পিরিয়ড এর বিপরীত। প্রতি মাসেই হতে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা একটি স্পষ্ট বিধান এখানে উল্লেখ করেছেন।

ফারজানা : তাই বলে কি মেয়েদের অপবিত্র বলে অসম্মান করে তাদের কাছে ঘেঁষতেও নিষেধ করবে?

নুসাইবা : ফারজানা, বুখারি শরিফের হায়েজ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, হায়েজগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে একলেপের নিচে শয়ন করতে।

অন্য জায়গায় উল্লেখ আছে, আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন—হায়েজ অবস্থায় আমি গ্লাসের যেদিক দিয়ে পানি পান করতাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেদিক দিয়ে পান করতেন।

এ ছাড়াও বুখারি শরিফের ২৯৫ থেকে ৩০০ নম্বর হাদিস দেখলে তুই স্পষ্ট বুঝে যাবি—পিরিয়ড অবস্থার কারণে নারীর পাশে ঘেঁষতে মানা করা হয়নি বিন্দুমাত্রও। বরং সবসময়ের মতো স্বাভাবিক রেখেছে, শুধুমাত্র যৌনমিলন ব্যতীত। যদি এখানে অপবিত্র বলা হতো—সাধারণত অপবিত্রের সাথে কিছু লাগলে সেটাও অপবিত্র হয়ে যায়—একেবারে স্পর্শ না করার কথা বলত, যা এখানে একদমই বলা হয়নি।

সারকথা হলো, পিরিয়ডের সময় স্ত্রীগমনের যে নিষেধ করা হয়েছে, তা মিলিত হওয়া সংক্রান্ত। অর্থাৎ সেসময় মিলিত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করা হয়েছে।

আর আয়শা রাদিআল্লাহু আনহার কথা দ্বারাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—সাধারণ রক্তের মতো পিরিয়ডের রক্তও নাপাক, সেজন্য শরীর নাপাক হলেও নারী নাপাক নয়। এমন না যে, পিরিয়ডের সময় স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে, কিংবা তার গায়ে স্পর্শ লাগাকেও অপবিত্রতা বলা হয়েছে। বরং এখানে নারীদের জন্য স্পষ্ট একটি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

ফারজানা চুপ হয়ে গেল। এদিকে বিরতির সময়ও শেষ হয়ে যাচ্ছে। নুসাইবা ফারজানাকে বলল–

নুসাইবা : সময় প্রায় শেষ। আমি যাই নামাজটা পড়ে আসি।

ফারজানা : আচ্ছা ঠিক আছে। যা।

◆◆◆

নারী নবি নয় কেন?

ফারজানা : আচ্ছা নুসাইবা, পৃথিবীর অর্ধেক তো নারী। তাদেরও রয়েছে ইবাদত। বিধিনিষেধ। পুরুষদের মতো তাদেরও নামাজ-রোজা করতে হয়। এসবের নীতিমালা তো বাতলে দেন নবি-রাসুলগণ। কিন্তু বল তো; এখনোবধি কোনো নারী নবি এসেছেন কি—যিনি নারীদের পথ বাতলে দিয়েছেন? আসেননি। এটা কোন ধরনের নিয়ম হলো?

নুসাইবা : ফারজানা শোন, প্রথমত নারীদের আল্লাহ তাআলা ঘরের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। স্বামী, সন্তান সামলানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। এ ছাড়াও নারীরা মাসের নির্দিষ্ট সময়ে একটি অপারগতার মধ্যে থাকে। আবার যিনি নবি হবেন; নামাজের ইমামতির দায়িত্ব তার। মাসের এই সময়গুলোতে একজন নারী নামাজ কীভাবে পড়াবে?

আবার দেখা গেল—নারীকে দাওয়াতের কাজ এবং সন্তানসন্ততি পালনের দায়িত্ব সব একসাথে দিয়ে দেওয়া হলো—তখন তার ওপর জুলুম হয়ে যাবে। না চাইলেও সন্তান লালনের দায়িত্ব মাকেই নিতে হবে; দুধ তো আর বাবা খাওয়াতে পারবে না।

আরেকটি বিষয় দেখ—হজরত মুসা, ঈসা, জাকারিয়া, ইউনুস, নুহ আলাইহিমুস সালাম দাওয়াত দিতে গিয়ে কতোভাবে অপমানিত হয়েছেন। অত্যাচার সহ্য করেছেন। সর্বোপরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের ময়দানে, কাবা চত্বরে, বাজারে, অবরোধে—কতোভাবে অপমানিত, অপদস্থ হয়েছেন। আঘাত পেয়েছেন। একজন নারী কীভাবে এটা সহ্য করবে?

শেষ একটা বিষয় দেখ, কতোভাবে নারীরা ধর্ষিত হচ্ছে। একজন নারী নবি যদি ঈমানের দাওয়াত দিতে দিতে ওই শ্রেণীর লোকদের সামনে পড়ে যেত—ধর্ষিত হতো। তখন কি তার সম্মানহানি হতো না?

ফারজানা : তাহলে নারীরা দীন শিখবে কীভাবে?

নুসাইবা : বিবাহের পূর্বে সে যদি পর্দা রক্ষা করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দীন শিখতে চায়, শিখবে। যেভাবে পুরুষরা শেখে। আর তা সম্ভব না হলে নিজের মা থেকে, বোন থেকে, বা অন্য যেকোনো মহিলা থেকে শিখবে। যেমন—আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে মহিলারা দীন শিখত। আর বিয়ের পর স্বামীর থেকে দ্বীন শিখবে। এটা বরং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শেখার চেয়ে সহজ এবং ফলপ্রসূ।

ফারজানা : আচ্ছা ইসলাম কি মেয়েদের কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ার অনুমতি দেয়? আমি তো জানি ইসলামিস্টরা তাদের মেয়েদের পড়ালেখা করতে দেয় না।

নুসাইবা : দেখ, আমিও কিন্তু পড়ালেখা করছি। এবং তোর সাথেই। এক ক্লাসেই। আমি আমার পর্দা বজায় রাখতে পারছি—তাই ইসলাম আমাকে নিষেধ করছে না।

সর্বোপরি বিষয় হলো—যে বিষয়ে যাকে দায়িত্ব দিলে ভালো হয়; ইসলাম তাকে সে দায়িত্বই অর্পণ করেছে। তোর স্বামী, সন্তান জন্ম দেয় না—তুই দেস। এখন তুই যদি বলিস, আমি পারব না জন্ম দিতে, আমার স্বামীরই সন্তান জন্ম দিতে হবে, দুধ খাওয়াতে হবে। তাহলে বল এটা সম্ভব কোনোভাবে? সম্ভব না। সেজন্য তোকেই সন্তান জন্ম দিতে হবে, দুধও খাওয়াতে হবে। এখন বল এসব দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে কি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘোরা সম্ভব?

মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘোরা, কখনো ভালো মানুষ কখনো-বা খারাপ মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো। এটা-ওটা শেখানো। মসজিদে ইমামতি করা। সকলের খবর রাখা, এসব সহজ হয়—পুরুষের জন্যই। সেজন্য আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরই সে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। বুঝেছিস?

ফারজানা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। পরবর্তী ক্লাসের বেল বেজে উঠল। সকলেই নিজ নিজ আসনে বসে গেল। নুসাইবাও চুপচাপ উঠে সিটে গিয়ে বসল। আর ফারজানা হারিয়ে গেল ভাবনার অসীম রাজ্যে।

নারীর সালাত ভাবনা

ক্লাসের সময় হয়ে যাওয়ায় তখন আর কথা হয়নি। ফারজানাও ডুবে গিয়েছিল ভাবনায়—এটা-ওটা নিয়ে। তখনই আরেকটি প্রশ্ন এসে উঁকি দিল ফারজানার মনে। পুরোটা ক্লাস অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখল প্রশ্ন করার প্রবল ইচ্ছাকে। ছুটির পর আর তা সম্ভব হলো না। বলেই ফেলল—

ফারজানা : আচ্ছা নুসাইবা, তুই তো নামাজ পড়লি। মহিলাদের নামাজের বিষয়ে হাদিসে যে পদ্ধতি দেখানো হয়েছে সে অনুযায়ীই তো—নাকি?

নুসাইবা : হ্যাঁ। সে অনুযায়ীই।

ফারজানা : আচ্ছা সিজদা করার নিয়মটা বল তো, নারীরা কীভাবে সিজদা করবে, পুরুষের মতো, না ভিন্নতা আছে?

নুসাইবা : আচ্ছা শোন, তাবেয়ি ইয়াজিদ বিন আবি হাবিব রহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন : 'যখন সিজদা করবে তখন শরীর জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো নয়।'[৩৮]

অন্য একজায়গায় বলা হয়েছে—আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো নারী যখন নামাজে বসে, তখন যেন সে তার উরু অপর উরুর ওপর রাখে। আর যখন সে সিজদা করে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে—যা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ তাআলা তাকে দেখে বলেন—হে আমার ফেরেশতারা, তোমরা সাক্ষী থেকো—আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।[৩৯]

এটাই পার্থক্য পুরুষ এবং মহিলার সিজদার মাঝে।

ফারজানা : এই তো ঠিক পথেই যাচ্ছিস। এখন তোকে একটি হাদিস দেখাই—দেখ, বলা হয়েছে, 'তোমরা ঠিকভাবে সিজদা করো! তোমাদের কেউ যেন সিজদায় তার হাতকে বিছিয়ে না দেয় যেভাবে কুকুর হাত বিছিয়ে দেয়।'[৪০]

---

[৩৮] কিতাবুল মারাসিল, ইমাম আবু দাউদ, হাদিস নং : ৮০; সুনানুল কুবরা, বাইহাকি, হাদিস নং : ৩০১৬।
[৩৯] সুনানুল কুবরা বাইহাকি, হাদিস নং : ৩৩২৪।
[৪০] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৮২২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৪৯৩।

কুকুরের মতো সিজদা করতে মানা করল, আবার মহিলাদের সিজদা করতে বলা হলো সেভাবেই—তাহলে কি মেয়েদের কুকুরের সাথে তুলনা করা হলো না?

নুসাইবা : আচ্ছা তাহলে তোর কথা হলো এভাবে কেন মহিলাদের সিজদা করতে বলা হলো—যেভাবে সিজদা করাকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে—তাই তো?

ফারজানা : হ্যাঁ।

নুসাইবা : একটা বিষয় দেখ, এখানে উপমা ব্যবহার করে বলা হয়েছে কুকুরের মতো। সরাসরি কুকুর বলা হয়নি। শস্যক্ষেত্র বলে বলে তোরা যেমন চিল্লাস; কিন্তু সেটাও যেমন উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—এটাও। তা ছাড়া তুই-ই বল কেউ যদি বলে, 'এভাবে চোরের মতো ঘরে ঢুকছিস কেন?' তাহলে কি তাকে চোর বলা হলো?

ফারজানা : না।

নুসাইবা : অর্থাৎ চোর এভাবে ঢোকে। যদিও ব্যক্তি চোর নয়। আরেকটা বিষয় শোন, ইসলামে নারীর পর্দার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে সর্বক্ষেত্রে। নামাজ পড়ার সময়ও যাতে পর্দার কোনো ঘাটতি না হয় সেজন্যই এ বিধান। নামাজ পড়ার সময় হঠাৎ কোনো পুরুষ ঘরে প্রবেশ করলেও যাতে পর্দার ব্যাঘাত না ঘটে এবং তার পর্দা অক্ষুণ্ণ থাকে। সতরের স্থান অস্পষ্ট থাকে। সেজন্যই এভাবে সিজদা করতে বলা হয়েছে নারীদের।

আর কুকুরের তুলনাটাও পুরুষদের জন্য করা হয়েছে। হাদিসটি বলা হয়েছে পুরুষকে লক্ষ্য করেই। নারীকে নয়।

মোদ্দা কথা, কোথাও কাউকে কুকুর বলা হয়নি। কুকুরের সাথে তুলনা করাও হয়নি। বরং বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং উপমা দিয়ে তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া কিছুই না। বুঝলি?

ফারজানা এবারও কিছু বলল না। চুপ করে রইল। তারপর দুজন বিদায় নিয়ে দুদিকে চলে গেল।

◆◆◆

১৬

ঙ্গসাইবার বিয়ে

নুসাইবার বাসায় ফিরতে খানিক দেরি হয়ে গেল। ফারজানাকে এটা-সেটা বোঝাতে অনেক সময় কেটে গেছে। বাসায় ঢোকার সময় বাবার ডাক পড়ল—

বাবা : কোথায় গিয়েছিলি, এতো দেরি কেন?

নুসাইবা : এই একটু ফারজানার সাথে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।

বাবা : যেদিন থেকে ওই কালো কাপড়টাকে গায়ে জড়িয়েছিস সেদিন থেকে ভয়ে আছি—কে জানে 'আইএস'-এ যোগ দিলি কি না! শুনেছি আইএস নাকি মেয়েদেরই টার্গেট করে।

নুসাইবা : আচ্ছা বাবা, কী হয়েছে বলবে তো?

বাবা : কিছু না। ঘরে যা। তোর মা তোর সাথে কথা বলবে।

মা : আমার সাথে আয়।

নুসাইবা মায়ের পিছনে ঘরে ঢুকল।

মা : দেখ মা, তুই ভালো করেই জানিস তোর বয়স হয়েছে। সময় হয়েছে বিয়ের। তোর বাবা তোর চাচাতো ভাই মিহাদের সাথে তোর বিয়ে দিতে চাচ্ছিল। আর জানিসই তো মিহাদ হলো আগাগোড়া বখাটে। তার সাথে তোর জীবন কাটানো অসম্ভব।

তাই অনেককিছু বুঝিয়ে তোর মামাতো ভাই মাহফুজের কথা রাজি করিয়েছি। ছেলেটা অনেক ভালো। পড়ালেখা শেষ করেছে। ভার্সিটিতে পড়া অবস্থায়ও নামাজ বাদ দিত না। তুই দেখেছিস হয়তো।

নুসাইবার এখন কী বলা উচিত নুসাইবা জানে না। মাহফুজকে দেখেছিল সে। ভার্সিটি পড়ুয়া একটি ছেলেকে এমন অবস্থায় দেখে তখন আফসোস হয়েছিল। আজান হলেই মসজিদে দৌড়।

কেমন সেকেলে সেকেলে ভাব। এতসব ভাবার পিছনে একটা কারণ ছিল। মাহফুজের প্রতি অজান্তেই সে একটা টান অনুভব করত। অথচ তখনও সে নাস্তিক ছিল। এসব মোল্লাদের দেখলেই গা জ্বালাপোড়া করত। তাও মাহফুজকে ভাল্লাগত নুসাইবার। কিন্তু কেন, নুসাইবার তা জানা ছিল না।

মাহফুজের ছোট বোন রেশনি। নুসাইবার সাথেই পড়ালেখা করে। রেশনি, নুসাইবার সমবয়সী। সবমিলিয়ে নুসাইবার অপছন্দের কোনো কারণ মাথায় এলো না। মাহফুজের প্রতি আকর্ষণটাও তীব্র অনুভব করল।

কিন্তু মাকে কীভাবে বলবে—সে যে রাজি! নুসাইবা চুপ থাকল। শুধু লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল অবয়ব। মনে পড়ল 'আর মেয়েদের জন্য চুপ থাকাটাই সম্মতি।'

এতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও ইসলাম ছাড় দেয়নি। বিধান দিয়েছে। নুসাইবা মনে মনে কৃতজ্ঞতা আদায় করল—মহান স্রষ্টার উদ্দেশে।

স্বস্তির হালকা একটি নিশ্বাস ছেড়ে অজান্তেই একটি মুচকি হাসি হেসে ফেলল। নিজেই নিজের কাছে কেমন লজ্জিত হয়ে গেল।

মায়ের যা বোঝার তিনি তা বুঝে নিলেন। হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভাব নিয়ে বললেন—

মা : আর বিয়েটা পরীক্ষার আগেই হচ্ছে। বিয়ের পর মাহফুজই পরীক্ষার দায়িত্ব নেবে।

নুসাইবা : আচ্ছা।

অস্ফুট স্বরে বলা কথাটি মনে করে নুসাইবা ফের লজ্জা পেল। এবার লজ্জায় মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে এল সে। তার চেহারা তখন লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া এক প্রস্ফুটিত গোলাপের রূপে রূপান্তরিত হয়েছে।

মা গমনপথে তাকিয়ে রইল। আর সন্তুষ্টির এক দীঘল মুচকি হাসি হাসল। শুকরিয়ার আওয়াজে বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ।'

একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর—

প্রশ্ন : মামাতো-চাচাতো ভাইদের সাথে যদি বিবাহ বৈধ হয়; তাহলে তো মামা-চাচাদের সাথেও বিয়ে বৈধ হওয়ার কথা ছিল। কারণ তাদের রক্ত তো একই। কিন্তু ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ কেন করল আর তাদের সন্তানদের সাথে জায়েজই-বা কেন করল?

জবাব : মামা-চাচা, তারা হলো সেই রক্তের যে রক্তে মা এবং বাবা। দাদা-দাদি, নানা-নানির রক্ত—যা মা-বাবার গায়ে সেটাই মামা-চাচার গায়ে। তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই।

কিন্তু মামা-চাচাদের স্ত্রীগণ ভিন্ন রক্তের। সে রক্তের সাথে ভাতিজা, ভাগিনার কোনো সম্পর্ক নেই। মামা-মামি, চাচা-চাচির রক্তের মিশ্রণে তৈরি মামাতো-চাচাতো ভাইবোন।

সুতরাং সেখানে রক্তের ভিন্নতা উপস্থিত। বিয়ে বৈধ। আর মামা, চাচা, ফুফু, খালাদের বিয়ে করতে ইচ্ছুক বেহায়া ছাড়া আর কেই-বা হতে পারে—যারা কিনা তার মা-বাবার মতো...

১৭

অদৃশ্য ফাঁদ
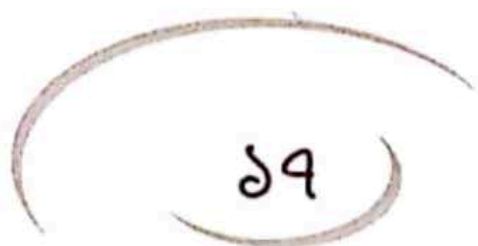
বিয়েটা হয়ে গেল পরের মাসেই। মাহফুজ সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা-পাগড়ি পরে এসেছিল। নুসাইবা শাড়ির ওপর কালো বোরকা চড়িয়ে মাহফুজের সাথে নতুন জীবনের সূচনা পোশাক পরেছিল। সেদিন দুজনকে একসাথে লাগছিলও বেশ। কালো আর সাদার সংমিশ্রণ সবসময় আকর্ষণীয়ই হয়। আর যদি একদেহের দুটি অঙ্গ মিশ্রিত হয়ে গড়ে ওঠে সেই মিশ্রণ—তবে তা সর্বোচ্চ আকর্ষণীয় হতে বাধ্য।

মামি, অর্থাৎ—নুসাইবার শাশুড়ির তাকে খুব পছন্দ অনেক আগ থেকেই। নুসাইবার পরিবর্তনে অনেক বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি। মাহফুজের জন্য এরচেয়ে উত্তম আর কেই-বা হতে পারত! তাই নিজ থেকেই মাহফুজের সাথে বিয়ের আলোচনা শুরু করেছিলেন তিনি। এবং শেষপর্যন্ত আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করেছেন।

এদিকে পরীক্ষার বাকি এক মাস। রেশমিরও। দুজনই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভালোই হয়েছে—দুজন একসাথে। না বুঝলে হেল্প নেওয়া যায়। কেউ না বুঝলে তো মাহফুজ আছেই। বেশ ভালো ছাত্র ছিল সে ছাত্রজীবনে। তাই এবার পরীক্ষা আগের তুলনায় ভালো হওয়ার আশাই নুসাইবার।

নুসাইবার মা প্রতিদিন ফোনে কথা বললেও বাবা কথা বলেন না। মামার সাথেও কথা বলেন। নুসাইবার সাথে কথা বলার বিষয় হলেই ফোন দিয়ে দেন মায়ের কাছে। কথা বলেন না। তা ছাড়া সব ঠিকঠাক। নুসাইবারও কষ্ট হয়। কষ্ট হয়, মিহাদের মতো একটা বখাটে ছেলের সাথে বাবা তাকে বিয়ে দিতে চেয়েছিল—এটা ভেবেও। একদিন গল্প করতে বসে রেশমিকে নুসাইবা বলল—

নুসাইবা : রেশমি, আমরা তো সবাই জানি মিহাদ কেমন ছেলে, তরপরও বাবা, মিহাদের সাথে আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছিল কেন, বল তো?

রেশমি : নুসাইবা, তোর বাবাকে তুই চিনিস, ভালো করেই জানিস তোর এই পরিবর্তন উনার পছন্দ হয়নি। তিনি চান না তুই এই পথে অটল থাক। তিনি চেয়েছিলেন যাতে তুই মিহাদের সাথে থেকে আবার সেই মুক্তমনা হতে পারিস। সেই পুরোনো অন্ধকারে ঢুকে যেতে পারিস—যাকে তোর বাবা আলো মনে করেন।

তবে এর একটা ভালো দিকও আছে। মিহাদ হওয়ার কারণেই ফুপু তাকে বোঝাতে পেরেছেন। না হয় অন্য কোনো ভালো ছেলেকে পছন্দ করলে তাকে বোঝাতে বেশ বেগ পোহাতে হতো, আর এদিক দিয়ে আমার ভাইজান ফসকে যেত।

সবই তাকদির। আসলে আল্লাহ্ সবকিছু ভালোর জন্যই করেন। কখনো শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কখনো পুরস্কৃত করার জন্য। আর এটা তোর পুরস্কার।

নুসাইবা : তবে জানিস রেশমি, বর্তমান প্রগতিশীল বাবাদের ধারণা এমন, মেয়েরা হাফপ্যান্ট পড়ুক, অন্যের চোখের লালসা হোক, ফ্রি মিক্সিং, মেলামেশা, লিভটুগেদার, অবৈধ সব করুক—সমস্যা নেই। সমস্যা তাদের একটাই, মেয়ে কেন ধর্ম মেনে নামাজ পড়বে, কেন তার চেহারাকে ঢেকে রাখবে, কেন পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টির কামনা হবে না!

নুসাইবা রাগে কান্নার স্বরে কথাগুলো বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

রেশমি : বাবাদেরই দোষ বিষয়টা এমনও না। তার থেকে অধিক মেয়েরাই তাদের নিজেদের জগৎ গড়তে ব্যস্ত। বয়ফ্রেন্ডকে অঘোষিত স্বামী ঘোষণা করে মেলামেশা, অপকর্মে ব্যস্ত। যার ফল পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার আগেই হত্যার মতো অপরাধ। আশ্চর্যের বিষয় হলো এটাকে কেউ আর অপরাধও ভাবে না। এমনই হয়ে গেছে এখনকার মেয়েদের মানসিকতা। যা তাদেরকে অধঃপতনের কিনারায় উপনীত করেছে।

নুসাইবা : আরও কিছু পুরুষ, সমানাধিকারের নাম করে, মুক্তচিন্তার নাম করে নারীদের ঘরের বাইরে আনছে। যার পিছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নারীদের ভোগের পণ্য করা। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, নাইটক্লাবে উপভোগের আইটেম বানানো। যা আমাদের শিক্ষিত নারীসমাজ কোনোভাবেই বুঝতে পারছে না। জড়িয়ে পড়ছে তাদের নোংরা ফাঁদে।

রেশমি : যেখানে তাদের ব্যক্তিত্বকে ধরে রেখে নিজেদের শিক্ষাকে কাজে লাগাবে, সেখানে তারা তাদের ব্যক্তিত্বকে ভুলে নিজেদের ভোগপণ্য করতে ব্যস্ত। কবে এই নারীজাতির হুঁশ ফিরবে! নিজেদের শান্তি, সুখের পথে ফিরে আসবে! নিজেদের প্রাপ্য সম্মান বুঝে নেবে! কে জানে কবে সেদিন আসবে! নাকি আদৌ আসবে না!

ধর্ষণ এবং বৈবাহিক ধর্ষণ
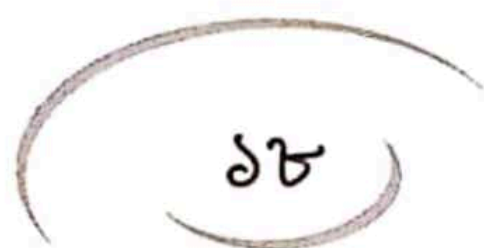
নুসাইবার পরীক্ষা শেষ। একটা টেনশন গুম হলো। হালকা লাগছে। কয়েকদিন কেটে গেল এভাবেই। ফারজানার কথা মনে পড়ছে। কী অবস্থায় আছে মেয়েটা—কে জানে! মেয়েটা একসময় দীন মেনে চলত । নামাজ-রোজা নিয়মিত আদায় করত। বেপর্দা বের হতো না। অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া সেই ফারজানাকে আলোতে আনার পূর্বে নুসাইবার যেন স্বস্তি মিলছে না। তাই একদিন মাহফুজের অনুমতিতে রেশমিকে নিয়ে ফারজানাদের বাসায় গেল সে।

কিছু না জানিয়ে হঠাৎ করেই ফারজানাদের বাসায় উপস্থিত নুসাইবা। ফোনেও জানানো হয়নি। ফারজানা রুমে বসে ফোন টিপছিল। নুসাইবাদের দেখে আনন্দে দাঁড়িয়ে গেল। ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস শেষে পাশে বসতে বলল। পাশে বসতে বসতে নুসাইবা জিজ্ঞেস করল—

নুসাইবা : কী করছিলি ফোনে?

ফারজানা : এই তো, একটা বই পড়ছিলাম।

নুসাইবা : কী বিষয়ক?

ফারজানা : ইসলাম নারীদের ধর্ষণের বিষয়ে কতো বড় অপরাধ করেছে—সে বিষয়ে।

নুসাইবা : যেমন?

ফারজানা : যেমন দেখ—ধর্ষিত নারী যদি চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারে তাহলে ধর্ষণকারীর কোনো শাস্তিই নেই, তুইই বল ধর্ষণ কি কেউ মানুষের সামনে করে—যে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করবে?

নুসাইবা : ফারজানা, সাক্ষ্য উপস্থাপন ছাড়া কি কারও ওপর দোষ দেওয়া ঠিক হবে? বা প্রমাণ না হলে? তোরাই তো বলিস দোষ প্রমাণিত হওয়ার আগে সবাই নির্দোষ। এখন ধর, তোর একার কথায় রায় দেওয়া হবে—তুই তো যে-কাউকেই ফাঁসিয়ে দিতে পারিস। যেমন—তোর বয়ফ্রেন্ডের ওপর রাগ হলো, মামলা ঠুকে দিলি—শেষ। তার মৃত্যুদণ্ড। এটা কি ঠিক হবে?

ফারজানা : তা না। কিন্তু প্রমাণটা কীভাবে করব?

নুসাইবা : এই তো লাইনে আসছিস। আসল কথা হলো প্রমাণ করা। যদি প্রমাণিত হয়ে যায় ধর্ষণ করা হয়েছে বা অমুক করেছে—তাহলে একজন সাক্ষী হলেও যথেষ্ট।

যেমন—একটি হাদিসে এসেছে, আলকামাহ বিন ওয়াইল রহিমাহুল্লাহ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জনৈকা মহিলা সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে নাগালে পেয়ে তার ওপর চেপে বসে তাকে ধর্ষণ করে।

সে চিৎকার দিলে লোকটি সরে পড়ে। এ সময় অপর এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে মহিলা ভুলবশত বলল, এ লোকটি আমার সঙ্গে এরূপ এরূপ করেছে। এ সময় মুহাজিরদের একটি দল এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। স্ত্রীলোকটি বলল—এ লোকটি আমার সঙ্গে এরূপ করেছে।

অতএব যার সম্পর্কে মহিলাটি অভিযোগ করেছে তারা দ্রুত এগিয়ে লোকটিকে ধরল। অতঃপর তারা তাকে তার নিকট নিয়ে এলে সে বলল—হ্যাঁ, এ সেই ব্যক্তি। তারা তাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন।

তিনি তার সম্পর্কে ফয়সালা করতেই আসল অপরাধী দাঁড়িয়ে বলল—আল্লাহর রাসুল, আমিই অপরাধী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্ষিত মহিলাটিকে বললেন—তুমি যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। আর নির্দোষ ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন।

যে ধর্ষণের অপরাধী তার ব্যাপারে তিনি বললেন—তোমরা একে পাথর মারো! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে এমন তাওবা করেছে যে, মদিনাবাসী যদি এরূপ তাওবা করে—তবে তাদের পক্ষ থেকে তা অবশ্যই কবুল হবে।[৫১]

এখন বল এখানে কি শুধু তার কথাতেই রায় হয়নি? রায় তো হয়েছেই। কারণ এখানে প্রমাণ হয়ে গেছে। মহিলার সে অবস্থার সত্যায়নই তার জন্য শাস্তি ঘোষণা করেছে।

[৫১] সুনানু আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪৩৭৯।

ফারজানা : আচ্ছা, বৈবাহিক ধর্ষণের বিষয়ে কী বলবি তুই? পিরিয়ড বা অসুস্থ থাকা অবস্থায় সহবাস কতোটা কষ্টের সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না, সে সময়ও জোর করে সহবাস। এটা কি ধর্ষণ নয়?

নুসাইবা : বৈবাহিক ধর্ষণ বলতে কী না কী বোঝায়—সেটা বলব না। কিন্তু ইসলামে যে বৈবাহিক ধর্ষণ বলতে কিছু নেই সেটা তোকে দেখাব।

ফারজানা : আচ্ছা ঠিক আছে দেখা।

নুসাইবা : একজন মেয়ে শারীরিক সম্পর্কে তখনই অনীহা প্রকাশ করে, যখন সে ঋতুমতী, ক্লান্ত বা অসুস্থ থাকে। এর মধ্যে কখনো কখনো না চাইলেও দেখা যায়—শেষপর্যন্ত সেও চায়। কারণ মানুষের সৃষ্টিই এমন। তারা এটা চাইবেই। এটা হয় সাধারণ অসুস্থ বা ক্লান্ত থাকা অবস্থায়।

এটাকে কোনোভাবেই ধর্ষণ বলা চলে না। আর পুরো সময়জুড়ে মানা করতে থাকে এমন হয় খুব অসুস্থ বা পিরিয়ড অবস্থায়। অধিক অসুস্থ অবস্থায় মিলিত হওয়া বা কষ্ট দিয়ে মিলিত হলে কাজির কাছে বিচার দায়ের করতে পারবে স্ত্রী—যদি স্ত্রী চায়। বিচারক তাদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে বা সমঝোতা করিয়ে দিতে পারবে।

কারণ এটা জুলুম হচ্ছে। আমি রিপিড করছি—যদি কষ্ট দেয়। অর্থাৎ সাধারণ যেভাবে সহবাস করে তার থেকে ভিন্ন পন্থায়—যন্ত্রণা কষ্ট হয়। বা অধিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও। তবে এ ক্ষেত্রে সমঝোতাই উত্তম পন্থা মনে হয়।

আর সাধারণ ইচ্ছা না হওয়ার সময় স্ত্রীর উচিত স্বামীকে তার ইচ্ছা পূরণ করতে দেওয়া। অন্যথায় স্বামী অনৈতিক কাজে জড়িয়ে যেতে পারে। সেজন্য ছোট ক্ষতি মেনে নেওয়া উচিত বড় ক্ষতির জন্য। আর অবশ্যই স্বামীরও খেয়াল রাখতে হবে তখনই মিলিত হওয়া যখন স্ত্রীও পরিতৃপ্ত হয়। যেমন বলা হয়েছে—

আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন সে যেন পরিপূর্ণভাবে সহবাস করে। আর তার যখন চাহিদা পূরণ হয়ে যায় অথচ স্ত্রীর চাহিদা অপূর্ণ থাকে, তখন সে যেন তাড়াহুড়ো না করে।[৪২]

[৪২] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং : ১০৪৬৮।

এখন রয়ে গেল পিরিয়ড বা মাসিক চলাকালীন স্ত্রীসহবাস সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা। চল এখন সেটাও দেখা যাক—বলা হয়েছে : 'আর তারা আপনার নিকট প্রশ্ন করে মাসিক সম্পর্কে, আপনি বলে দিন এটি অশুচি। কাজেই তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী (সহবাস) হয়ো না—যতক্ষণ না তারা পরিপূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়।'[৪৩]

হাদিসে দেখা যাক কী বলা হয়েছে : 'মাসিকের সময় রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সাথে যথারীতি একত্রে পানাহারের ও ঘরে একসাথে বসবাসের নির্দেশ দেন। শুধু সহবাস প্রসঙ্গ ব্যতীত। এতে ইয়াহুদিরা বলল, এ লোকটি আমাদের কোনো একটি বিষয়েরও বিরোধিতা না করে ছাড়ছে না।'[৪৪]

আরেক হাদিসে আছে : 'আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করল, নিশ্চয়ই সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।'[৪৫]

এই হলো পিরিয়ড, মাসিক বা হায়েজকালীন স্ত্রীসহবাসের নীতিমালা, ইসলাম যা প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলাম এমন নিয়ম করে দিয়েছে যাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনই সম্মতিতে পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পারে। একজায়গায় বলা হয়েছে :

'তোমরা অপেক্ষা করো রাত পর্যন্ত যাতে স্ত্রী তার অবিন্যস্ত চুল আচড়ে নিতে পারে। প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারে।'[৪৬]

এ ছাড়াও বলা হয়েছে : 'কেউ যেন পশুর মতো তার স্ত্রী হতে নিজের যৌন চাহিদাকে পূরণ না করে। বরং তাদের মধ্যে চুম্বন এবং কথাবার্তার দ্বারা শৃঙ্গার হওয়া উচিত।'[৪৭]

এখন তুই-ই বল বৈবাহিক ধর্ষণটা কোথায়? যদি বলিস অনুমতি ছাড়া করলেই ধর্ষণ তাহলেও বলব ইসলামে এটারও কোনো জায়গা নেই। কারণ বিয়ে মানে সম্মতি প্রদান। যৌনমিলনের। অনুমতি দেওয়া হয়েছে স্ত্রীর পক্ষ থেকে।

[৪৩] সুরা বাকারা : ২২২।
[৪৪] জামে তিরমিজি, হাদিস নং : ৩১৭৭।
[৪৫] জামে তিরমিজি, হাদিস নং : ১৩৫।
[৪৬] সহিহ বুখারি শরিফ, হাদিস নং : ৪৮৬৫।
[৪৭] দাইলামির মুসনাদ আল-ফিরদাউস, হাদিস নং : ২/৫৫।

আরেকটা কথা হলো—অধিক কষ্টে এবং পিরিয়ড অবস্থায় ইসলামে সহবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং বিনা কারণে মিলনে অসম্মতি সাময়িক সময়ের জন্য হয়। পুরো সময়জুড়ে নয়। সেজন্য এটা কোনো ধর্ষণই নয়। না অনুমতিহীনও নয়। তাই তুই এটা কোনোভাবেই বলতে পারিস না ইসলাম বৈবাহিক ধর্ষণে সম্মতি দেয়, বা বৈবাহিক ধর্ষণ বলতে ইসলামে কিছু আছে।

ফারজানা : অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে, হত্যার ভয় দেখিয়ে, যদি কেউ মিলিত হয়—তবে কি সেটাকে ধর্ষণ বলা হবে না? অনুমতি নিয়ে সেক্স করেও এটা যেমন ধর্ষণ হচ্ছে জোরপূর্বক হওয়ায়—তেমনই বিয়ের মাধ্যমে অনুমতি পেয়ে জোরপূর্বক সেক্স করার কারণে ওটাও বৈবাহিক ধর্ষণ হচ্ছে।

নুসাইবা : ফারজানা, বিয়ে কোনো জোরপূর্বক অনুমোদনপত্র নয়। আর এটা কোনো বাংলা সিনেমার গল্পও নয়—যে, অস্ত্র দেখিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেবে আর সবকিছু তার হয়ে যাবে। অথচ মাসআলা এমন—ছেলের প্রস্তাব মেয়ের বাবা গ্রহণ করল, কিন্তু মেয়ে নাকচ করল; বিয়ে হবে না।

ইসলামে বিয়েতে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপক মূল্যায়ন রয়েছে। একজন নারী চাইলেই তার ইচ্ছেমতো স্বামী পছন্দ করতে পারে। বাবার পছন্দের ছেলেকে সে চাইলে পছন্দ করবে, না হয় করবে না—এতে কোনো জোরজবরদস্তির জায়গা নেই। অর্থাৎ ইসলাম পুরোটা বিবাহ এভাবে ঘটান—দুজনেরই অনুমতি তাতে বিদ্যমান থাকে। এবং তাদের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে ধরা হয়। কিন্তু অস্ত্র দেখিয়ে, মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে অনুমতি নেওয়া সম্পূর্ণ জোরপূর্বক। এটা তাকে দিতেই হবে। তাই এই দুটোকে একত্র করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।[৪৮]

ফারজানা কিছুটা থেমে গেল। চুপ রইল আরও কিছুক্ষণ। তারপর নাস্তা আনার কথা বলে ইতস্ততবোধ ঢাকল।

◆◆◆

[৪৮] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে 'নারীর কি ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই?' লেখাটি পড়ুন।

১৯
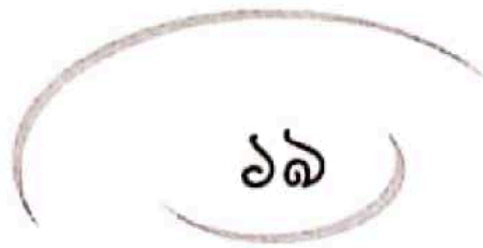
নারির পর্দা

ফারজানা নুসাইবাদের জন্য নাস্তা নিয়ে এলো। নাস্তা সামনে রাখতে রাখতেই বলল—এই যে তোরা বোরকা পরতে বলিস, পর্দা করতে বলিস—এসব কি নারীর পরাধীনতা নয়? নারীকে ঘরবন্দী করা নয়? এটা কি নারী-উন্নয়নের পথে বাধা নয়?

নুসাইবা : উন্নতির পথে বাধা! তাই তো বললি? আচ্ছা উন্নতির সংজ্ঞা কী? টাকা? তোরাই তো বলিস—'একজন শিক্ষিত মা দাও, একটি শিক্ষিত জাতি দেব।' জাতির চেয়ে কি টাকা বেশি দামি হয়ে গেল? একজন মা পেটে সন্তান নিয়ে অফিস করবে, সন্তান হওয়ার পর সকাল থেকে সন্ধ্যা কাজ করবে। এসে নেয়েখেয়ে ঘুম। পরদিন পুনরায় সেই রুটিন। আর এদিকে বাচ্চা থাকবে অশিক্ষিত মূর্খ কোনো বুয়ার কাছে। সারাদিন বুয়ার কাছে রেখে তোর শিক্ষাকে কাজে লাগাবি? শিক্ষিত জাতি গড়বি? হবে না। তুই ফুলটাইম অফিস করবি, আর তোর সন্তান তোর শিক্ষা থেকে দূরে থাকবে। এই সন্তান দিয়ে শিক্ষিত জাতি গঠন সম্ভব? তোর সন্তান দিয়ে শিক্ষিত জাতি গড়তে হলে তোকে তার খেয়াল নিতে হবে। সময়মতো পড়াতে হবে। ভুল করলে শোধরাতে হবে। তবেই-না শিক্ষিত জাতির স্বপ্ন দেখা সম্ভব। না হয় পয়সা ঠিকই পাবি—সুসন্তান অসম্ভব। আর জাতি তো বহুত দূর। উন্নতির সংজ্ঞা তো এটাই হওয়া চাই, আর এটা করতে হলে তোকে ঘরে থাকতে হবে।

তাহলে মাসিকের ব্যথা নিয়ে অফিসে দৌড়াতে হবে না। সন্তান পেটে নিয়ে কাজ করা লাগবে না। ছোট্ট বাচ্চা রেখে সারাদিন বাহিরে থাকতে হবে না। ফলে সন্তানের দেখভাল করতে পারবি। একটি শিক্ষিত, উন্নত জাতির স্তম্ভ নির্মাণ করতে পারবি। না হয় যেমন আগামীকে ধ্বংস করবি—তেমন বৃদ্ধ বয়সে নিজ ঘর ছেড়ে বৃদ্ধাশ্রমে পাড়ি জমাতে পারবি। এটাই কি তোর উন্নতির সংজ্ঞা?

আর বললি—পর্দা নারীর পরাধীনতা। শোন, পর্দা আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন। আর এর মধ্যেই রয়েছে নারীর নিরাপত্তা। পর্দার মাধ্যমে মানসিক বিকারগ্রস্ত, নির্জনতাপ্রিয় কোনো পুরুষ নির্জনতার সুযোগে নারীকে নিজের যৌন চাহিদা মেটানোর পাত্র বানাতে পারে না।[৪১] এতে করে নারীর সর্বোচ্চ দামি, সম্মানিত বস্তু অক্ষুণ্ণ থাকে।

এখন বলবি পুরুষদেরই তো দোষ। আমাদের কেন পর্দা করতে হবে, বোরকা পরে চলাফেরা করতে হবে? হ্যাঁ, দোষ পুরুষেরই। কিন্তু ক্ষতিটা আমাদের। নারীদের।

---

[৪১] ধর্ষণের মূলত তিনটি কারণ ধরা হয়, নির্জনতা, উত্তেজক, মানসিক বিকারগ্রস্ততা। এই তিনটি একসাথে হলে ধর্ষণ হবেই।

ফারজানা : কিন্তু পর্দা কেন শুধু নারীর জন্যই হবে?

রেশমি : ফারজানা, পর্দা শুধু নারীর জন্যই নয়। বলা হয়েছে : 'আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।'[৫১]

পর্দা সবার জন্যই। কিন্তু পুরুষদের আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব দিয়েছেন পরিবারের সকলের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে, সেজন্য তাদের বাইরে থাকতে হয় অধিক। আর নারীদের বের হওয়ার অনুমতি নিজ মাহরামের সাথে করে দিয়েছেন যাতে তার নিরাপত্তা এবং সম্মান দুটোই অক্ষুণ্ণ থাকে।

[৫১] সুরা নুর : ৩০।

আর সেজন্য যেমন এর বিচার প্রয়োজন—প্রয়োজন নিজেদের নিরাপত্তাব্যবস্থারও। এজন্যই পর্দার বিধান করা হয়েছে।

ফারজানা : ইসলামের শুরুর যুগে তো পর্দা ছিল না। তাতে তো কোনো সমস্যা হতো না। এবং পর্দার বিষয়টা তো তোদের আল্লাহ্ বা তোদের নবি কারোরই মাথায় ছিল না। এটা তো কেবল উমরের মত ছিল।[৫০]

এটা দিয়ে তো স্পষ্ট বোঝা যায়—মুহাম্মাদের যখন যে বিষয়ে বিধানের প্রয়োজন হতো, শুধু বলে দিত। মূলে কুরআন তো মুহাম্মাদেরই তৈরি।

নুসাইবা : ফারজানা, তুই জানিস, ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানই অবতীর্ণ হয়েছে একেকটি অবস্থাতে। যে বিষয়ে হুকুম প্রয়োজন সে বিষয়ে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। একজন হায়েজের বিষয় জানতে চেয়েছে; তখন আল্লাহ তাআলা হায়েজ সম্পর্কে বিধান দিয়েছেন। আর সেই বিধান অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ থেকে কিছু বলেননি। এবং তখনই বলেছেন যখন সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন।

পর্দার বিষয়টাও ঠিক সেরকমই। যতক্ষণ পর্দা বিষয়ক কোনো বিষয় সামনে আসেনি, আল্লাহ তাআলা বিধান অবতীর্ণ করেননি। তাই তিনিও কিছু বলেননি। সেজন্যই প্রথম যখন উমর রাদিআল্লাহু আনহু পর্দার মত দিলেন; তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বিষয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু এরপর যখন সাওদা রাদিআল্লাহু আনহার ঘটনা ঘটল তখন আল্লাহ তাআলা বিধান অবতীর্ণ করলেন। এমনই হতো সবসময়। হোক পুরুষের বিষয়ে কোনো বিধান বা নারীর।

রেশমি : ফারজানা, তুমি বললে পর্দা আমাদের ঘরে বন্দী করে রাখার জন্য। তোমার এই ধারণাটাও ভুল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারীরা নারীদের কাছে আসত, যেত, শিখত, জ্ঞান অর্জন করত। হজরত উম্মুল মুমিনিনরা নারীদের শেখাতেন। বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়া দিতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা সকলকে শেখাতেন। ফতোয়া দিতেন। নারী সাহাবিরা তার নিকট আসতেন, যেতেন। কিন্তু স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে মাহরাম সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

এবং এখনো দেখো, বোরকা পরে নারীরা পড়ালেখা করছে—মাদরাসা, ভার্সিটিতে। কেউ তো ফতোয়া দেয় না এটা নিষিদ্ধ। বরং উৎসাহ জোগায়।

[৫০] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৫৮৮৪; সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ১৪৮।

ইসলাম কি নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে?

ফারজানা : নুসাইবা জানিস, ইসলাম এমন এক সভ্যতা যা নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে। তুই-ই বল শিক্ষিত নারী ছাড়া শিক্ষিত সন্তান, আদর্শ জাতি গড়ে তোলা সম্ভব?

নুসাইবা : অবশ্যই না। শিক্ষিত নারী ছাড়া শিক্ষিত জাতি গঠন অসম্ভব। কিন্তু শিক্ষা যে শুধু স্কুল, কলেজেই হয়—এমন তো না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরও অনেক আছে। সেগুলোও শিক্ষা। যেমন—দীনি শিক্ষা। পুরোটাই নৈতিকতা এবং আদর্শের ওপর। আর তুই বললি ইসলাম নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে, তুই কি এটা প্রমাণ করতে পারবি?

ফারজানা : আচ্ছা বঞ্চিত করেনি—মেনে নিলাম। কিন্তু গুরুত্বই-বা কী দিয়েছে? দিয়েছে কোনো গুরুত্ব?

নুসাইবা : ফারজানা, নারী শিক্ষা বিষয়ে ইসলাম কী বলেছে, কেমন গুরুত্ব দিয়েছে—জানার জন্য প্রথমে আমাদের জানতে হবে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে কেমন গুরুত্ব দিয়েছে। চল আগে সেটা দেখি!

এক আয়াতে বলা হয়েছে : 'আপনি বলে দিন যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? নিশ্চয়ই জ্ঞানীরাই শ্রেষ্ঠ।'[৫২]

অন্য আরেক আয়াতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল এমন কেন বের হয় না—যারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করবে।'[৫৩]

কুরআনের আয়াত ছাড়াও বিভিন্ন হাদিসে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। যেমন : 'হুমায়দ বিন আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুকে খুতবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার মঙ্গল চান—তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।'[৫৪]

অন্য এক হাদিসে বলা হচ্ছে : 'কায়স বিন হাযিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেবল দুটি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ।

[৫২] সুরা জুমার : ১০।
[৫৩] সুরা তাওবা : ১২২।
[৫৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১০৩৭।

এক. সে ব্যক্তির ওপর, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দুই. সে ব্যক্তির ওপর, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।'[৫৫]

সাহাবায়ে কেরামগণ জ্ঞান অর্জন নিয়ে কী বলে দেখ, উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা নেতা হওয়ার পূর্বেই জ্ঞানার্জন করে নাও! আর আবু আবদুল্লাহ বুখারি বলেন, আর নেতা বানিয়ে দেওয়ার পরও—কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ বৃদ্ধ বয়সেও ইলম অর্জন করেছেন।

এই সমস্ত আয়াত, হাদিস, আর বিজ্ঞদের কথা দ্বারাই সুস্পষ্ট হয় ইসলামে জ্ঞান অর্জনের কতো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে কারণে দেখা যায় জ্ঞান অর্জনের জন্য আগেকার মুসলিম মনীষীরা দূরদূরান্ত পর্যন্ত সফর করত। উন্দুলুস থেকে ইরাক। একটি মাত্র কথার জন্য মরুভূমি পাড়ি দিয়েছে। পায়ে হেঁটে একদেশ থেকে ভিন্নদেশে সফর করেছে। এমন দৃষ্টান্ত অহরহ। একটি কথা যার থেকে শিখেছে তাকে শিক্ষক হিসেবে সম্মান করে গিয়েছে। চাই সে যে-ই হোক। হজরত আলি রাদিআল্লাহু আনহুর প্রসিদ্ধ একটি কথা আছে : 'যে আমাকে একটি শব্দ শেখাল, সে চাইলে আমাকে বিক্রি করে দিতে পারে।'

ফারজানা : এসব তো বুঝলাম। কিন্তু নারীশিক্ষার বিষয়ে কী বলল?

নুসাইবা : ফারজানা, এখন তুই-ই বল—এসব জায়গার কোথাও কি বলা হয়েছে—তোমরা পুরুষরা জ্ঞান অর্জন করো, নারীরা করবে না!

ফারজানা : না, তা বলা হয়নি।

নুসাইবা : এখানকার উল্লেখিত সকল ফায়দা নারী-পুরুষ সকলেরই। ইসলাম কখনো নারীশিক্ষার বিরোধিতা করেনি। কিন্তু যখনই পর্দা খেলাফের বিষয় আসে, তখন ইসলাম বলে—প্রয়োজন নেই। যদি পর্দা রক্ষা করে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়—করো! কিন্তু পর্দা পালনে ক্ষতি হবে বলে মনে হলে, কোনো নারী শিক্ষিকা বা মাহরাম কারও থেকে জ্ঞান অর্জন করো!

আমরা চাই আমাদের মেয়েরা নারী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিক। আর সেজন্য নারী ডাক্তারের প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

[৫৫] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ১৪০৯।

কিন্তু এমন প্রয়োজন হলো গাইনি চিকিৎসা। এটা হলো যখন পর্দা রক্ষা করে সম্ভব হবে না তখন। কিন্তু যদি পর্দা রক্ষা করে সম্ভব হয়, ডাক্তার হোক ইসলাম কখনো নিষেধ করবে না। আর এখন পর্দা রক্ষা করে এসব সম্ভব। যেমন আমরা করছি।

তাই তোকে বলি কী, ইসলাম নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে—এমন ফাঁকা বুলি আর কখনো আওড়াবি না। ইসলাম শুধু সেটাই করতে নিষেধ করে যার জন্য ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ছুটে যায়। বুঝলি?

নারী–কুকুর–গাধা

ফারজানা কথা ঘোরাতে চাইল। তাই নারীশিক্ষা বদলে অন্যদিকে মোড় নিল–

ফারজানা : এই শোন, তোরা কি জানিস—ইসলাম নারীকে গাধার সাথে তুলনা করেছে ?

নুসাইবা : বলিস কী? দেখি কোথায় বলেছে, দেখা তো?

ফারজানা : এই দেখ—হজরত আবু জর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাতরত ব্যক্তির সামনে হাওদার খুঁটির ন্যায় কোনোকিছু না থাকলে আর নারী, গাধা ও কালো কুকুর তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামাজরত ব্যক্তির নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম—লাল বর্ণের কুকুর আর কালো বর্ণের কুকুরের মাঝে পার্থক্য কী? তিনি বললেন, তুমি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞেস করলে আমিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন—কালো কুকুর হলো শয়তান।[৫৬]

এখন তো তোরা বলবি এখানে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়নি বরং উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেজন্য শোন—তোদের হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহার একটি হাদিস দেখাই : 'হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তার সামনে সালাত নষ্টকারী জিনিসের আলোচনা করা হলো। লোকেরা বলল, নামাজি ব্যক্তির সামনে কুকুর, গাধা ও মহিলা অতিক্রম করলে এগুলো তার সালাত নষ্ট করে দেয়। আম্মাজান আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুরের সমান করে দিয়েছ? আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি সালাত আদায় করছেন আর আমি তাঁর এবং কিবলার মাঝে চৌকির ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছি। কোনো কোনো সময় আমার বের হওয়ার প্রয়োজন পড়ত, এবং তাঁর সামনের দিকে যাওয়া অপছন্দ করতাম। এজন্য আমি চুপে চুপে সরে পড়তাম। আ'মাশ রহিমাহুল্লাহও আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৫৭]

এখন তোরাই বল, এখানে কি নারীকে গাধা এবং কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়নি?

নুসাইবা : ফারজানা, এই দুইটি হাদিস কী সম্পর্কে তুই জানিস?

---

[৫৬] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৯৫২।
[৫৭] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫১১।

ফারজানা : হোক যে সম্পর্কেই—সেটা মূল কথা না। কথা হলো স্পষ্টই এখানে নারীকে গাধা এবং কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

নুসাইবা : কী সম্পর্কে সেটা জানলে তো আর ক্ষতি নেই। চল সেটা আগে জেনে নিই! উসমান রাদিআল্লাহু আনহু সালাতরত অবস্থায় কাউকে সামনে রাখা মাকরুহ মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন তা মুসল্লিকে অন্যমনস্ক করে দেয় এবং তার খুশুখুজু নষ্ট করে দেয়। কিন্তু যদি অন্যমনস্ক না করে তাহলে জায়েদ বিন সাবিত রাদিআল্লাহু আনহুর মতানুসারে কোনো ক্ষতি নেই। তিনি বলেন, একজন আরেকজনের সালাত নষ্ট করতে পারে না।

এবার বুঝতে পেরেছিস, সালাতে সমস্যা হওয়া, না হওয়া নিয়ে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। সালাত অবস্থায় কেউ সালাতি ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে বা সামনে দিয়ে গেলে কী হুকুম সেটাই বর্ণনা করা হয়েছে এই হাদিসে। যদি নামাজরত ব্যক্তির সামনে কোনো খুঁটি জাতীয় কিছু না থাকে সে অবস্থার নামাজের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। নারীদের গাধা বা কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়নি।

এখন তো বলবি, গাধা, কুকুর না হয় নামাজ নষ্ট করল কিন্তু নারী তো মানুষ। এটা কি নারীর অসম্মান না? এখানে হুকুমের মধ্যে তো পুরুষকেও শামিল করা সংগত ছিল কিন্তু তা করা হলো না—কেন?

এটার সাধারণ একটা উত্তর হলো—পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট। সালাতের সময় নারী সামনে চলে এলে সালাতের খুশুখুজু নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেজন্যই নারী, সালাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে না।

ফারজানা : আচ্ছা এটা ছাড়াও হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহার কথায়ও তো স্পষ্ট হয়ে যায়—নারীদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

নুসাইবা : এখানে তোর একটি ভুল হচ্ছে। এখানে আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলল, এরা নামাজ ভেঙে দেয়। তাদের প্রত্যুত্তরে তিনি চুপ থাকেননি বরং প্রতিবাদ করেছেন। তাদের কথাকে সংশোধন করে দিয়েছেন। আর হাদিস হিসেবে আয়শা রাদিআল্লাহু আনহার হাদিসই অধিক গ্রহণযোগ্য।

তাহলে এবার বুঝ, হাদিস বর্ণিত হয়েছে নামাজের রুকন সম্পর্কে আর এখানে লোকদের একটা ভুল ধারণাও দূর করা হয়েছে, মহিলা অতিক্রম করলেই নামাজ ভেঙে যাবে বিষয়টা এমন নয়—যেমনটা তারা বুঝেছিল।

উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। প্রয়োজন হলে সরে যেতেন। তার শরীরের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের স্পর্শও লাগত। এমন অবস্থায় তো রাসুলের নামাজ নষ্ট হতো না। তাহলে কেন এখানে এ বিষয়টা আসবে?[২৮]

শোন, এজন্যই বলছি এই দুইটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে নামাজের রুকন সম্পর্কে কিন্তু তোরা হাদিসটির বিষয়ে না জেনে মনমতো ব্যাখ্যা করে দিলি, কেমন যেন না পড়েই থিওরি আওড়াতে লাগলি। তাতে হাদিসটির বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই হলো না। তাই বলি আরও পড়, আরও শেখ! তাহলেই উপলব্ধি করতে পারবি ইসলাম নারীকে অসম্মান করেনি। দিয়েছে রাজরানির মতো সম্মান।

[২৮] এ বিষয়ে মাসআলা অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবানদের থেকে জেনে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে।
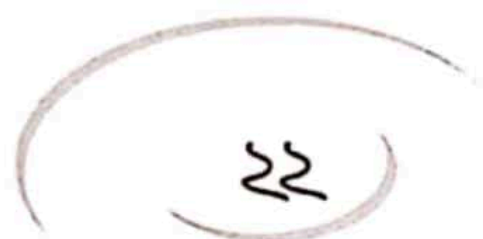
ইসলাম কি মায়ের সম্মান দেয়নি?

ফারজানা : তুই বললি হাদিস আমি বিকৃত করেছি, কিন্তু হাদিস তো তোরা বিকৃত করেছিস!

ফারজানা কিছুটা রেগে গিয়ে বলল মনে হয়।

নুসাইবা : হাহ্। বল শুনি কীভাবে?

ফারজানা : মায়ের সম্মান বোঝানোর জন্য তোরা একটি হাদিস ব্যবহার করিস, হাদিসটি এরূপ : 'হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একলোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল—আল্লাহর রাসুল, আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা। সে বলল অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা।'[৭১]

এখন দেখ, প্রথমত 'উত্তম ব্যবহার' শব্দটির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 'সুহবাতুন' শব্দটি। আর সাধারণভাবে এই শব্দের অর্থ হয় 'সঙ্গ'। কিন্তু তোরা এখানে অর্থবিকৃতি করে বলছিস 'ব্যবহার'—এটা কি হাদিসের বিকৃতি নয়?

নুসাইবা : আচ্ছা তোর কথাটা একটু ঘেঁটে দেখি চল, আরবি ডিকশনারি কী বলে এই শব্দের অর্থে সেটা আগে দেখি। সুহবাতুন অর্থ—সঙ্গ, সাহচর্য, সান্নিধ্য, সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, সঙ্গী, সাথি। আচ্ছা, উত্তম বন্ধুত্ব কি খারাপ ব্যবহারে হয়? নাকি উত্তম সান্নিধ্য খারাপ ব্যবহার? ভালো সম্পর্কটা কি দুর্ব্যবহারে হয়

ফারজানা : এটা কি শাব্দিক অর্থে গরমিল হলো না?

নুসাইবা : আচ্ছা ফারজানা বল তো, ব্যবহার জিনিসটা কি আলাদা কোনো একটি বিষয়, নাকি ভালো সম্পর্ক, বন্ধুত্ব রক্ষা করা, ভালো সঙ্গী হওয়া মিলিয়েই ভালো ব্যবহার?

ফারজানা চুপ রইল।

নুসাইবা : আচ্ছা ফারজানা, এখন তুই বল তোর সন্তান থেকে ভালো সম্পর্ক, উত্তম সাহচর্য চাইবি কি না?

---

[৭১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৯৭১।

ফারজানা : বিয়েই তো করিনি।

খুবই সংক্ষিপ্ত আওয়াজে বলল ফারজানা।

সবাই মিলে একধাপ হেসেও নিল।

নুসাইবা : আচ্ছা ধর তোর সন্তান হলো।

ফারজানা : হুম হলো।

নুসাইবা : এখন তুই বল তোর সন্তান যদি তোর সাথে ভালো সম্পর্ক রক্ষা করে, ভালোভাবে তোর সামনে আসে, তোর সাথে বন্ধুর মতো চলে—তাকে কি তুই বেআদব বলবি? বা আমাকে বেআদব বলার সুযোগ দিবি?

ফারজানা : না।

নুসাইবা : এখন তুই-ই বল এটা কি উত্তম ব্যবহার না? এসব মিলিয়েই কি উত্তম ব্যবহার হয় না?

ফারজানা : এটা ছাড়াও আরেকটা বিষয়ে তোরা বিকৃতি করেছিস!

নুসাইবা : আচ্ছা বল—ওটাও শুনি।

ফারজানা : তোরা বলিস মায়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই এখানে তিনবার মায়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু একটি হাদিসে বলা হয়েছে : 'আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম দিতেন, তিনবার সালাম দিতেন। আর যখন কোনো কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন।'[৩৩]

দেখলি, তিনি তার অভ্যেস অনুযায়ী তিনবার বলেছেন। কোনো গুরুত্ব বোঝানোর জন্য নয়। কিন্তু তোরা এটা বলে বেড়াস গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই এখানে তিনবার মায়ের কথা বলা হয়েছে। এটা কি বিকৃতি নয়?

নুসাইবা : আচ্ছা শোন, এই হাদিসটি বুখারি শরিফের 'ইলম অধ্যায়'-এ বর্ণিত হয়েছে। ভালোভাবে বোঝানোর জন্য তিনবার কোনো কথা বলা সম্পর্কে। এবং এটার উদাহরণ যেমন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণ শেষে তিনবার বলেছিলেন, 'আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?'

[৩৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৯৪।

এখন চল এই হাদিসটি অন্য হাদিসগুলোর মাধ্যমে নিরীক্ষণ করি। বুখারি শরিফের ২৫৯৭, ৫৫৫০, ৬৭৮৫ নম্বর হাদিসে দেখা যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসটি বলার পর তিনবার বললেন, 'আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?'

এবং এই হাদিসগুলোর দিকে দেখলে সহজেই বোঝা যায় গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই তিনি তিনবার বলতেন। এটা থেকেও বোঝা যায় এখানে তিনি মায়ের গুরুত্ব বেশি বুঝানোর জন্যই তিনবার বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, এই জায়গাগুলোতে তিনবার বলা আর উপরোক্ত হাদিসে বর্ণিত রূপ দুটি ভিন্ন। হাদিসগুলোতে পর পর তিনবার বলতেন। কিন্তু এখানে তিন প্রশ্নের জবাবে তিনবার বলেছেন। অর্থাৎ ওটা আর এটার মধ্যে পার্থক্য আছে এবং অধিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই বলা হয়েছে।

মোটকথা হলো তুই যেভাবেই নিবি সেভাবেই হাদিসটি মায়ের সম্মান বোঝানোর জন্যই বলা হয়েছে বলেই প্রমাণিত হবে।

এসব ছাড়াও কুরআন-হাদিসের অহরহ জায়গায় পিতামাতার সম্মানের কথা বলা হয়েছে। তাদের মুখ দিয়ে আফসোসের 'আহ' শব্দটিও যেন বের না হয়—এমন হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

এখন বলবি এসব তো মায়ের জন্য বিশেষভাবে বলা হয়নি। পিতার জন্যও বলা হয়েছে। আচ্ছা তুই-ই বল, তোর জীবনে কি তোর বাবার কোনো অবদান নেই? তিনি কি তোর জন্মের কারণ নন? তিনি কি তোকে ছোট্ট থেকে বড় করার দায়িত্ব নেননি? অবশ্যই নিয়েছেন। এখন তোর বিচারে তুই বল তাকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন আছে কি না? তোর থেকে ভালো ব্যবহারের প্রাপ্য তিনিও কি না?

ফারজানা : হুম।

অস্ফুটস্বরে বলল ফারজানা।

নারীস্বাধীনতা কি নারীর মুক্তি?

ফারজানার বাড়ি থেকে ফিরছিল নুসাইবা আর রেশমি। নুসাইবা আনমনে ভেবে যাচ্ছিল কিছু একটা। টিভি চলছিল গাড়িতে। স্ক্রিনে একটি মুভি চলছিল। নুসাইবা মুভির আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছে—এটা কোন মুভি। একসময় এটা তার ফেভারিট লিস্টে ছিল। কিন্তু এখন এর আওয়াজও বিষাক্ত মনে হয়।

নুসাইবার মুভির সিনগুলো মনে পড়ে। একজন নারীকে কীভাবে পণ্য করা হয়—সেটা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছে এখন। এগুলো নাকি আর্ট! হাসি আসে নুসাইবার। নারীদেহ দেখানো, তাকে ভোগ করাটাই আর্ট হয়ে গেছে। আবার এতেই নাকি নারীর মুক্তি। অথচ কতো সহজেই তাদের পণ্য করে নিচ্ছে। ভোগবাদী সমাজের এক ভোগবাদী পরিকল্পনাই নারীর আজকের এই পণ্য হওয়ার কারণ। পাশ্চাত্যের তৈরি পুঁজিবাদী উন্নয়নের কাঁঠিবিশেষ এই নারীবাদ।

রেশমি : কীরে, এতো কী ভাবছিস?

রেশমির কথায় হুঁশ ফেরে নুসাইবার।

নুসাইবা : রেশমি, স্ক্রিনে একটা মুভি চলছে। মুভিটা আমার দেখা। আমার প্রিয় মুভি ছিল। তখন খুব ভালো লাগত। বারবার দেখতাম। কিন্তু এই মুভিতে নারীদের অপমান বৈ সম্মান করা হয়নি। একটা নারীর সবচেয়ে সম্মানিত জিনিস হলো তার সম্ভ্রম। কিন্তু এই মুভিতে নারীর সেই মূল্যবান জিনিসটির কোনো দামই দেওয়া হয়নি। বরং তার দেহকে সম্বল করে পুঁজি হাসিল করছে—যেন এটা একটা ব্যবসায়িক পণ্য মাত্র।

আসলে কী জানিস নারীদের ভোগের পণ্য বানানোই এখানে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী উদ্দেশ্য। একজন নারীকে বিজ্ঞাপন বানাবে, তার দেহকে সকলের সামনে উন্মুক্ত করবে, আর তা দিয়ে ব্যবসা করবে। অশ্লীলতা দিয়ে যেমন হাতিয়ে নেবে লক্ষ-কোটি টাকা, তেমনই ধ্বংস করে দেবে যুবসমাজের চিন্তাশীলতা। শুধু একটি কঙ্কালসার মাথাই থেকে যাবে—যা পাশ্চাত্যের গোলামির বাইরে কিছু ভাবতেই পারবে না। ও হ্যাঁ, এসব উলঙ্গপনাও নাকি আর্ট। উলঙ্গতাই যদি আর্ট হয় তাহলে মুভিতে পুরুষদেরও উলঙ্গ করে ছেড়ে দেয় না কেন? এই আর্টের জন্য কেন শুধু নারীকেই নির্বাচন করা হয়?

রেশমি : আসলে এটা তাদের বুলি মাত্র। একটা অন্যায় কাজের একটি সুন্দর নাম দিলেই দেখবি তার অর্ধেক দোষ মাফ। অর্ধেক দোষ আড়াল।

তখন এই ভালো নামের আড়ালে ঘটে যাওয়া এতো এতো নিকৃষ্ট কাজগুলো কেউ খেয়ালই করবে না।

নুসাইবা : এই যেমন নারীবাদ। নারীস্বাধীনতার নাম করে নারীদের দিয়ে ব্যবসা। সুন্দর একটা নামের কারণে তাদের দোষ চাপা। হাজার হাজার নারী এটাই তাদের মুক্তির পথ ভেবে তাদের পাতানো ফাঁদে পড়ে ইজ্জত, সম্মান বিসর্জন দিচ্ছে। হচ্ছে ভোগপণ্য। কিন্তু নারীবাদ—পাশ্চাত্যের উন্নতি ছাড়া আর কোনো কাজেই আসছে না।

রেশমি : এতো এতো বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড, আর মুভির নামে নারীর সবচেয়ে সম্মানের জিনিসকে কেঁড়ে নিচ্ছে এরা, এতে কিন্তু কারও কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মি টু আন্দোলনে এতো বড় বড় সেলিব্রিটি নায়িকারা তাদের সম্মানহানির কথা প্রকাশ করল। তাদের বেইজ্জতির কথা তুলে ধরল। প্রতিটি পদে পদে যেখানে সম্ভ্রম হারানোর গল্প—সেখানে নারীর নিরাপদ ভবিষ্যৎ কীভাবে সম্ভব? নাকি নারীর ইজ্জত নষ্টই উন্নতি?

নুসাইবা : কেউ বলবে, চোর চুরি করবে ভেবে কি ঘুমাব না? ধর্ষণ হবে জানি তাই বলে কি ঘরে বন্দী হয়ে থাকব? কেন রে, চোর চুরি করবেই ভেবে দরজা-জানালা খুলে ঘুমাস কদিন? দরজা ভেতর থেকে লাগিয়ে রাখিস কেন? ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তালা লাগানোরই-বা কী প্রয়োজন?

রেশমি : চোরের ভয়ে যেমন দরজা লাগিয়ে ঘুমাস সতর্কতার জন্য। তেমনই নিজের নিরাপত্তার জন্যই পর্দা করতে বলা হয়েছে। পুরুষদের বলা হয়েছে তোমাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখো, নারীদের বলা হয়েছে নিজেদের সম্মানরক্ষার্থে পর্দা করো এবং পরপুরুষ থেকে দূরে থাকো।

নুসাইবা : কেউ বলবে বোরকা কেন পুরুষ পরবে না? তারা কি একটা প্রশ্নের সহজ উত্তর দেবে—সব জায়গায় কেন নারীদেরই পোশাক খোলা হয়? ধর্ষণ কেন নারীদেরই করা হয়? আসলে তারা এটা ভাবতে রাজি না—নারীদের মাঝে আলাদা প্রভাব আছে। আকর্ষণ আছে। তারা পুরুষদের মতো না। আর প্রভাব তো দামি জিনিসেরই থাকে। কেউ কি দামি জিনিসের বদলে ন্যূনমানের জিনিস নেয়?

রেশমি : কিছু কিছু নারী, নারীবাদের সুন্দর নামের ধোঁকা খেয়ে তাদের মতো উলঙ্গ হতে শুরু করেছে। তারা ভাবছে এতেই তাদের সম্মান। অথচ এই পথের প্রথম সারির নারীরাই আন্দোলন করে যাচ্ছে—'তাদের অসম্মান করা হয়।'

নুসাইবা : আসলে ওদের বুলির কোনো মূল্য থাকত না, যদি না—নারীদেরই একাংশ তাদের সাথে তাল মেলাত। আসলে এসব নারীবাদীরা নারীদের অসম্মানের জন্য যতটুকু দায়ী, তারচেয়ে বেশি দায়ী এই শ্রেণির নারীরাই।

◆◆◆

নুসাইবা আর রেশমি বাসে আসার সময় পাশের সিটের এক হিন্দু ভদ্রমহিলার আওয়াজ শুনতে পেল। সাথে আরেকজন মহিলাও ছিল। কথায় বোঝা যাচ্ছে নাস্তিক টাইপের। ধর্মের অসাড়তা, নারীস্বাধীনতা নিয়ে বেশ বয়ান ঝাড়ছিল। হিন্দুধর্মে নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলছে। মাঝখানে ইসলাম নিয়ে বলা থেকেও বিরত রইল না। মোটকথা সে চাচ্ছে, ধর্মই বিশ্বাস না করুক!

লাগামহীন বলেই চলল মহিলাটি। পাশের সিঁদুর পরিহিতা মহিলাটি শুনছে। মাঝে মাঝে কথায় সায় দিচ্ছে—মাথা নাড়িয়ে, মুচকি হেসে। নুসাইবাও চুপচাপ শুনল, কিন্তু যখন একই অপবাদ ইসলামের ওপর চাপাল নুসাইবার চুপ থাকা সম্ভব হলো না। বাসের মধ্যে অন্যদের কথার মাঝে ঢুকে যাওয়াটা যদিও ভদ্রতা নয়—তবুও ইসলামের অবমাননার চেয়ে সেটা কমই। তাই নুসাইবা মাথাটা এগিয়ে নিয়ে নিম্নস্বরে বলল, দিদি ভালো আছেন?

বোরকা পরা একটি মেয়ের চেহারা ঢেকে করা প্রশ্নটি তাদের একজনারও পছন্দ হয়েছে বলে মনে হলো না। কিন্তু সৌজন্যবোধ থেকেই বলল, হ্যাঁ ভালো আছি। আপনি?

নুসাইবা : জি ভালো। আসলে আপনাদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুনে মনে হলো আপনাদের সাথে কথা বললে আমারও একটু জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, ভালো লাগবে। তাই আরকি।

ভদ্রমহিলা : হুম ঠিক আছে। সমস্যা নেই।

নাস্তিক মেয়েটি বরং আনন্দিত হলো—একজন শ্রোতা বাড়ল ভেবে। শ্রোতা ছাড়া বক্তৃতা দিলে খুব একটা জমে না। মেয়েটি ঝেড়েকেশে নিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করল—

এই যে দেখেন দিদি, মনুসংহিতায় নারীদের নিয়ে মনু লিখেছে, 'চণ্ডাল, ঋতুমতী স্ত্রী, ব্রহ্মবধ করেছেন এমন পতিত ব্যক্তি, দশদিন পর্যন্ত নবপ্রসূতা সূতিকা, শব ও শবস্পর্শী—এদের স্পর্শ করলে স্নানের মাধ্যমেই শুদ্ধ হওয়া যায়।[৬১]

সন্তান জন্মের দশদিন পর্যন্ত মহিলাদের গায়ে স্পর্শ লাগলে অশুদ্ধ হয়ে যায়। এবং স্নান ছাড়া শুদ্ধ হতে পারে না।

[৬১] মনুসংহিতা, ৫/৮৫।

অর্থাৎ মনুসংহিতা এখানে নারীদেরকে অপবিত্র বলে ঘোষণা করছে, যেকারণে অন্য কারও গায়ে স্পর্শ লাগলেই গোসল করার কথা বলছে।

শুধু এটাই নয়, এ ছাড়াও সতীদাহ, বিধবা বিয়ের অনুমতি না দেওয়াসহ অহরহ নারী নির্যাতনের রূপরেখা তৈরি করে রেখেছে এই হিন্দুধর্ম। নারীদের তারা সবসময় অবমূল্যায়নই করেছে। দেবতাদের মাঝে নারী থাকলেও হিন্দুধর্মের ইতিহাসে নারী নির্যাতিত শত শত বছর যাবত। তবুও কীভাবে বলা যায় হিন্দুধর্ম নারীর সম্মান দেবে?

এমনই দেখা যায় সব ধর্মে। হোক হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামেই। সব ধর্ম নারীর ওপর অন্যায়ই করেছে। তাই বলি এসব ধর্মকর্ম ছাড়ুন! নিজেকে এগিয়ে নিন!

মেয়েটির কোনো কারণ ছাড়াই অন্য ধর্মের ওপর নির্ভর করে ইসলামকেও সে পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা হাস্যকর লাগল নুসাইবার। তাই কথার মাঝখানেই বলতে শুরু করল—

নুসাইবা : হিন্দুধর্ম নারীর সাথে এমন করেছে। শত শত বছর নারীদের ওপর নির্দয় অত্যাচার চালিয়েছে। অপরদিকে দেখুন, নারী যখন মেয়ে হিসেবে জন্ম নেয়—তখন সে রহমত। নারী যখন স্ত্রী তখন একে-অপরের অংশ—তোমরা (পুরুষরা) তাদের পরিচ্ছদ, তারা (মহিলারা) তোমাদের পরিচ্ছদ।[৯২]

আবার এই নারী যখন একজন সন্তানের মা হন, তখন তার সম্মান আরও বেড়ে যায়। তার সাথে উত্তম ব্যবহার করা আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বাগ্রে।[৯৩]

হিন্দুধর্মে যেখানে বিধবা জীবিত জ্বালিয়ে দেওয়া হতো, সেখানে ইসলামের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে শুধু একজন স্ত্রী ছাড়া সকল বিয়ে করেছেন বিধবা। ইসলামের প্রধান চার খলিফাও বিধবা বিয়ে করেছেন।

সন্তান জন্মের পর, মাসিকের সময় হিন্দুধর্ম নারীকে অপবিত্র বলে তাদের গায়ের স্পর্শ লাগাতে মানা করে, ইসলাম সেখানে শিক্ষা দিয়েছে একই গ্লাসের একই সাইট দিয়ে পানি পান করতে। একসাথে শয়ন করতে।[৯৪]

---

[৯২] সুরা বাকারা : ১৮৭।

[৯৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৯৭১।

[৯৪] পিরিয়ড অংশে দেখুন।

এতে না কেউ অপবিত্র হচ্ছে, না কাউকে অবমাননা করা হচ্ছে। এরপরও আপনি হিন্দুধর্মের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছেন ইসলামকে?

নুসাইবা একদমে কথাগুলো বলে থামল। সিঁদুর পরিহিতা হিন্দু ভদ্রমহিলাটি একটু তাকিয়ে দেখল। নাস্তিক টাইপের মেয়েটি রাগেই তাকাল। খানিক আগের উজ্জ্বলতা কেমন মলিন হয়ে গেল। কিন্তু কী আসে যায়! নুসাইবারই-বা কী করার—শুরু তো সে-ই করেছে।

ভদ্রমহিলা : স্টপেজ এসে গেছে। এখন আমাদের নামতে হবে।

বলেই মহিলা দুজন উঠে দাঁড়াল। বাস থামতেই নেমে পড়ল সবার সাথে পাল্লা দিয়ে। নুসাইবা, রেশমির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। রেশমিও বিনিময়ে মুচকি হাসি উপহার দিল।

রাতে ফিরে নুসাইবা কেমন মনমরা হয়ে রইল। মাহফুজ বুঝতে পারছে না, কী হয়েছে। একটু পর পরই জানতে চেয়েছে—কী হয়েছে? কিন্তু কিছুই বলছে না নুসাইবা। শুধু বলেছে—এমনিই, কেন জানি ভালো লাগছে না।

মাহফুজ, নুসাইবার পাশ ঘেঁষে তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে হৃদয় নিংড়ানো আওয়াজে বলল—কী হয়েছে? নুসাইবা হঠাৎ মাহফুজের কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে ফেলল।

নুসাইবা : জানেন, আব্বুর জন্য আমার অনেক চিন্তা হয়। যদি এভাবেই তিনি মারা যান—তখন আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে কেমন ব্যবহার করবেন?

নুসাইবা কথাটা বলে থামতেই দরজায় কড়া নাড়ল কেউ। নুসাইবা উঠতে চাইলে মাহফুজ ইশারায় বসতে বলল। উঠে গিয়ে দরজা খুলল মাহফুজ। দরজা খুলতেই দুটি পরিচিত চেহারা নুসাইবার মুখে হাসি ঢেলে দিল।

শুভ্র দীর্ঘ জামায় তার বাবাকে আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে। সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক দীর্ঘ হাসি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন বাবা এবং মা। নুসাইবা তাকিয়ে রইল—অবাক হওয়া চাহনি নিয়ে। সালাম দিতেও ভুলে গেল। বাবা সালাম দিলেন। নুসাইবা কিছুটা শরম পেল। কিন্তু আনন্দটা আরও দীর্ঘ।

কেমন আছিস?

কাঁধে হাত রেখে নুসাইবার মায়ের প্রশ্ন।

নুসাইবা কোনো কথা বলল না, অথবা সেদিকে তার খেয়ালই নেই। বাবার বুকে আছড়ে পড়ল সে। ফুপিয়ে কেঁদে ফেলল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করানোর জন্যই হয়তো এই পদ্ধতি। বাবা, মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আদর করলেন। মায়ের বুকে সুখ খুঁজল। সেই অনিন্দ্য সুখ।

রাতের খাবার শেষে মা-বাবার জন্য আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে নুসাইবা নিজ ঘরে এল। কিছুক্ষণ আগের আর এখনকার নুসাইবার মাঝে বেশ তফাত লক্ষ করল মাহফুজ। দুঃখ এবং আনন্দের তফাত। অনেক আনন্দের মাঝেও নুসাইবা হঠাৎ মনমরা হয়ে যেত। জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলত না। আজ মাহফুজ বুঝল কী কারণ ছিল সেই মনখারাপের পিছনে। মাহফুজের নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো। আল্লাহ সকলকে এমন নেককার জীবনসঙ্গিনী দেন না—তাকে দিয়েছেন। সেজন্য অশেষ শুকরিয়া সেই মহান রবের দরবারে।
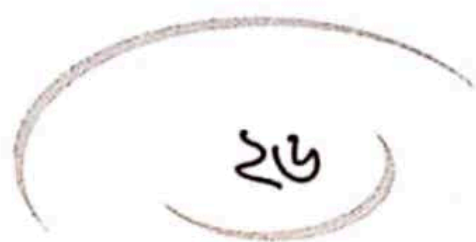
পরিবর্তনের সূচনা

মাহফুজ নুসাইবার দিকে তাকিয়ে তন্ময়তার ভাব নিয়ে মুচকি হেসে বলল, আপনি তো ভালো হাসেন। সবসময় হাসেন না কেন?

মাহফুজ দুষ্টুমি করে অনেক সময় নুসাইবাকে আপনি বলে সম্বোধন করে। নুসাইবাও বোঝে। তারপর একটু থেমে মাহফুজ বলতে লাগল—

মাহফুজ : দেখো নুসাইবা, হেদায়েত আল্লাহ্ তাআলার দান একটি বৃহৎ নেয়ামত। তুমি কিংবা আমি শত চাইলেও কাউকে হেদায়েত করতে পারব না—যদি না আল্লাহ্ তাআলা চান। যেমন তিনি বলেন : 'আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। তবে আল্লাহ্ তাআলাই যাকে ইচ্ছা হেদায়াতের পথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই অধিক অবগত আছেন।'[৬৫]

সেজন্য সেই মহান রব্বে কারিমের প্রতি আমাদের নিখাদ কৃতজ্ঞতার বিকল্প নেই। তিনিই তো সবকিছুর পরিচালক, পরিচায়ক। তিনি ছাড়া না কেউ এসেছে, না কেউ আসবে। না কেউ সঠিক পথ পেয়েছে, না কেউ পাবে।

আর তিনিই শিখিয়েছেন কৃতজ্ঞ হতে। যেমন বলেন : 'যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।'[৬৬]

অন্যত্র বলেন : 'আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও! যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়—আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'[৬৭]

সেজন্য আমাদের উচিত সবসময় সেই মহান রবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তার সকল সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তার প্রদর্শিত পথে নিজেদের পরিচালিত করা। আর চেষ্টা করে যাওয়া বোধোদয়ের। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন। আর তাঁর জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা। আলহামদুলিল্লাহ্।

◆◆◆

[৬৫] সুরা কাসাস : ৫৬।
[৬৬] সুরা ইবরাহিম : ৭।
[৬৭] সুরা লোকমান : ১২।

রেশমির বিয়ের কথা চলছে। ছেলে মাদরাসা পড়ুয়া আলেম। বিয়ের ব্যাপারে চলমান কুসংস্কার উপেক্ষা করে দুজন দুজনকে দেখে পছন্দ করে—পরিবারের উপস্থিতিতে। বিয়ের পূর্বে ছেলের বাবার সামনেও যেতে হয়নি রেশমিকে। ছেলের বাবাও একজন আলেম। ছেলের মায়ের বেশ পছন্দ হয়েছে রেশমিকে। বিয়েটাও হয়ে যায় খুব দ্রুত। পছন্দ হলে আর দেরি করার কোনো কারণই চোখে পড়েনি রেশমির মা-বাবা, বা শ্বশুর-শাশুড়ির। রেশমির নতুন জীবনের সূচনা হয়।

বিয়ের পরদিন ওলিমা অনুষ্ঠিত হয়।

দুদিন পর রেশমি স্বামীর সাথে বাপের বাড়ি আসে। নুসাইবা প্রিয় বান্ধবীকে পেয়ে বেশ আনন্দিত হয়। দুজন মিলে অনেক কিছু রান্না করে। একটু-আধটু দুষ্টুমিও করে—এটা, ওটা নিয়ে। গল্পে গল্পে কেটে যায় গোটা দিন।

সন্ধ্যায় নুসাইবা রেশমির সাথে বসে আছে। মাহফুজ রেশমির স্বামী ইলিয়াসকে নিয়ে বেরিয়েছে। রেশমিকে উদ্দেশ করে নুসাইবা বলল—

নুসাইবা : রেশমি, তোর জানা আছে—আমি জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই কাটিয়েছি অন্ধকার আর ধোঁকার রাজ্যে। তুই তখনও আমার সাথে ছিলি। হয়তো আরও অনেক দিন ওভাবেই কেটে যেত, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সেইপথ থেকে ফিরেছি আমরা। দেখ, এখনো আমরা একসাথেই। সেজন্য মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি সবসময়। আলহামদুলিল্লাহ।

শোন, আল্লাহ তাআলা বিয়েকে অর্ধেক দীন করেছেন। এটা শুধু পড়তাম আর জানতাম। কিন্তু বিয়ের পর সেটা উপলব্ধি করেছি। করছি। আগে ইবাদতের মাঝে যতটুকু মজা না পেতাম এখন তারচেয়ে বেশি পাই। আগে নামাজে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে মনোযোগ চলে যেত। কিন্তু বিশ্বাস কর, বিয়ের পর ওটা আর হয় না। পূর্ণ মনোযোগ থাকে নামাজের ভেতর। বিয়ের আগে শাস্তি মনে হতো বিয়েটাকে, কিন্তু এখন বলতে হয় বিয়ে থেকে দূরে থাকাটাই বরং শাস্তি।

বিয়ে যেমন গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে—তেমনই ইবাদতের মাঝে প্রশান্তি আনয়ন করে। মন সবসময় প্রশান্ত থাকে। ভরসা থাকে। আগে তোকে এসব বলিনি। বললে তুই না বুঝে ঠাট্টা করতি। কিন্তু এখন তুই বুঝবি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তোর সঙ্গী মিলিয়েছেন। দোয়া করি আল্লাহ তোদের সুখী করুক!

সংসারের কাজে সবসময় স্বামীকে সহযোগিতা করবি। সে যখন বাইরে থাকে তখনও উপস্থিতের মতোই চলবি।

ঘরের কাজ করবি। সময় পেলে ঘরে বসে বসে হস্তশিল্পের কাজ করবি। তোর এতদিনের পড়ালেখা দিয়ে ইলিয়াসকে তার ব্যবসায় সহযোগিতা করবি। যখন মা হবি সন্তানকে তোর শিক্ষায় শিক্ষিত করবি। কখনো অফিস বা চাকুরির কথা চিন্তা করবি না।

এটা নারী উন্নয়নের নামে নারীকে অপবিত্র করা মাত্র। তোর অনেক শিক্ষিত বান্ধবী তোকে ভর্ৎসনা করবে—এতো পড়ালেখা করে কী করলি? ঘরে থাকার জন্য পড়েছিস? তখন খেয়াল করবি—আসলে এদের কাছে উন্নতি মানে টাকা। উন্নতির ব্যাখ্যা অনেক অনেক টাকা। একটি শিক্ষিত পরিবার বা জাতি এদের মুখের বুলি—উদ্দেশ্য নয়। এরা শুধু নিজের জন্য করে, একটি সুন্দর সুশীল জাতির জন্য নয়। এরা অদৃশ্য গোলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলাম। এদেরকে পাশ্চাত্যের গোলামির অন্ধকার থেকে বের করা কঠিন। এদের মস্তিষ্ক তাই বোঝে, যা পাশ্চাত্য বোঝায়। পাশ্চাত্য বুঝিয়েছে নারীদের মুক্তি অফিসে আর সিনেমার পর্দায়—এটাই ওরা লুফে নিয়েছে।

তোর শিক্ষা তোর কাজে লাগাতে হবে। তোর পরিবার গড়তে হবে। ইসলামের আলো ছড়াতে হবে। এভাবেই তোর পরিবারের আলো অন্য পরিবারকে আলোকিত করবে। এভাবেই একটি সুন্দর, আল্লাহভীরু সমাজ গঠিত হবে। এভাবেই চেষ্টা করে যেতে হবে। চেষ্টা করতে শেখাতে হবে আমাদের স্বামীদেরও। তারা আল্লাহর সঠিক বিধান সকলের কাছে পৌঁছে দেবে। আমরা তাদের উদ্বুদ্ধ করব। কষ্ট পেলে মনে শক্তি জোগাব। সাহস দেব। তবেই পরিবর্তন আসবে, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে। আর এটাই হতে পারে পরিবর্তনের সূচনা।

বিশ্বাসের একটি সংজ্ঞা আছে। দলিল এবং প্রমাণ ছাড়া কোনোকিছু বিশ্বাস করা। তার বিপরীত, দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে বিশ্বাস করানো বিশ্বাস নয়—প্রমাণিত সত্য। আর আল্লাহ তাআলা ঈমান দিয়ে যা বলেছেন তা বিশ্বাস। অর্থাৎ দলিল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর একত্ববাদ, তার দেওয়া সকল বিধান বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়া।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : 'নিশ্চয়ই যারা না দেখে আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার।'[৯৮]

এই বিশ্বাসটা কেমন তার একটি উদাহরণ এমন হতে পারে; কারও সাথে আপনি তর্কযুদ্ধ করছেন। কিন্তু হেরে গিয়েছেন। তার মানে এটা হয়—তার কথা আপনি মেনে নেবেন। কিন্তু এমনটা হবে না। আপনি সেখানে তার কাছে হার মানবেন ঠিকই, কিন্তু তার কথাকে মেনে নেবেন না। তখন কেউ আপনাকে বলবে 'ধর্মান্ধ'।

যুক্তিতে হেরে যাওয়ার পরও যখন আপনার বিশ্বাসের জন্য কেউ ধর্মান্ধ বলবে তখন বুঝবেন আপনি একজন বিশ্বাসী। আপনি একজন ঈমানদার। আপনার ঈমান যদি যুক্তির সামনে হার মেনে যাওয়ার কারণে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তাহলে জেনে নেবেন সেটা ঈমান বা বিশ্বাস ছিলই না। অর্থাৎ আপনি কখনো মুমিন ছিলেনই না। আপনার নতুন করে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়াটা কোনো বিষয় না।

আমাদের অবশ্যই যুক্তিবিদ্যায় নিজেদের পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু যুক্তিই শেষ সমাধান নয়—এটাও বুঝতে হবে। আর সেজন্য আমাদের দৃঢ় হতে হবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। যুক্তির হারকে কখনো ঈমানের হার ভাবা যাবে না। কোনোকিছুতেই আমাদের ঈমানে একবিন্দু খলল আনা যাবে না। দৃঢ় থাকতে হবে সবসময়, সব মুহূর্তে।

হজরত আলি রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন, 'ইসলাম কারও যুক্তিতে চলে না। ইসলাম চলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথে।' তাই কোনো বিষয়ে আপনার প্রমাণ থাকুক আর না থাকুক, যুক্তি থাকুক আর না থাকুক। তথাপিও আপনি যখন সেটা মেনে নিতে পারবেন—তখনই সেটা ঈমান বা বিশ্বাস হবে।

যুক্তি-বিজ্ঞান-দর্শনের পাল্লায় মেপে ইসলাম মানা যাবে না। যুক্তি-বিজ্ঞান-দর্শনকে ইসলামের পাল্লায় মাপতে হবে। যদি সে পাল্লায় দর্শন বা যুক্তি প্রমাণিত হয়—তবেই তা মানা যাবে, বিশ্বাস করা যাবে।

---

[৯৮] সুরা মুলক : ১২।

কিন্তু এমন দেখা গেল ইসলামের সাথে মিলছে না। দর্শন বা যুক্তি বলে একটা, ইসলাম বলে উলটো। তবে দর্শন এবং যুক্তিকে পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলামকেই মানতে হবে। তবেই সেটা ঈমান।

ধরুন—কোনো ব্যক্তি একটি রোবট বানাল। অবশ্যই এই রোবট সম্পর্কে সেই সবচেয়ে ভালো জানে। তারপর রোবটটিতে কথা বলার শক্তি দেওয়া হলো। চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা দেওয়া হলো। ভালো-মন্দ চিন্তারও সুযোগ দেওয়া হলো। কিন্তু তাকে অনুভবশক্তি দেওয়া হলো না। তাহলে কি রোবটটি অনুভব করতে পারবে? পারবে না।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অস্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনিই কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর তিনিই সবচেয়ে বিজ্ঞ—মানুষ সম্পর্কে। সবকিছু সম্পর্কে। তবে তিনি আমাদের চলার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

ভালো-মন্দ চিন্তারও। কিন্তু আমাদের জন্য কোনটা ভালো—এটা তাঁরই ভালো জানার কথা। সুতরাং তিনি আমাদের জন্য যেটা ভালো হিসেবে নির্ণয় করেছেন, সেটাই আমাদের জন্য সর্বোচ্চ উপকারী। এবং সেটাই আমাদের করতে হবে।

আমরা জানি আমাদের চিন্তাশক্তির সীমাবদ্ধতার কথা। বা আমাদের যেকোনোকিছুর সীমাবদ্ধতার কথা। যার বাহিরে কোনোকিছু করার বা ভাবার সামর্থ্য আমাদের নেই। তবে এ সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন যিনি এই সীমাবদ্ধতার স্রষ্টা।

যিনি সীমাবদ্ধতা দিয়েছেন তিনি অবশ্যই সীমা দিয়েছেন। সুতরাং অবশ্যই তিনি অসীম। তিনিই কেবল পারেন সকলকিছুর জবাব দিতে।

আর তিনি নিজ অসীম প্রজ্ঞা দ্বারা বান্দার জন্য যেটা উপযুক্ত ভেবেছেন—সেটাই বান্দার জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। সুতরাং বিনাবাক্যব্যয়ে তা মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আর মেনে নিতে পারলেই বিশ্বাসী বা ঈমানদার। আর আমাদের সেই ঈমানদারই হতে হবে।

ইসমাইলি শিয়া নামে শিয়াদের একটি গ্রুপ ছিল। সম্মিলিত ফতোয়া অনুযায়ী তারা ভ্রান্ত। তারা ধারণা করত সমস্তকিছুর পিছনে যুক্তি আছে। তারা বলত—এই কারণগুলো তারা জানে। কিন্তু সব জানা অসম্ভব। কারণ বান্দার জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

তাদের মতবাদ ছিল প্রত্যেকটা কাজের পিছনে যুক্তি খোঁজা। যা তাদের বিভ্রান্ত করেছে। কারণ, স্রষ্টার সৃষ্টির পিছনের রহস্য সৃষ্টির অবগত হওয়ার কথা নয়।

স্রষ্টার কানুন, হুকুম হিসেবে মানাই সৃষ্টির কাজ। যুক্তির কারণে বাতিল বা অতিরিক্তের কোনোই অবকাশ নেই।

তাই আমাদের প্রত্যেককে ওই বিধান মেনে নিতে হবে যা তিনি আদেশ করেছেন। এবং পরিত্যাগ করতে হবে তিনি যা নিষেধ করেছেন।

আর সেটাই ঈমান। বা ঈমানদার হওয়ার প্রথম স্তর। তারপর তাঁর বিধিনিষেধ অনুযায়ী আমল করতে হবে। তবেই একজন পরিপক্ক ঈমানদার হওয়া যাবে। আর একজন পরিপক্ক ঈমানদারের জন্যই রয়েছে সকল নেয়ামত।

পশ্চিমা বিশ্বের দুর্গন্ধ মিশ্রিত নারীনীতির নাম নারীবাদ।
যার কবলে পরে ঈমান হারা হচ্ছে শত-শত নারী ও পুরুষ।
আল্লাহর দেওয়া বিধানের বাহিরে তাদের চাওয়া দুনিয়ার
খাহেশাত পূরণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।
অথচ আল্লাহর বিধানের বাহিরে আদৌ কোনো স্বাধীনতা নেই।
যা আছে কেবলই তা ক্ষতিকর মনুষ্য সভ্যতার জন্য।
আর সে ক্ষতিকর বস্তু থেকে মানুষকে এক আল্লাহর পথের
আহ্বানই নুসাইবাদের কাজ।
সে নুসাইবারা-যারা নুসাইবা বিনতে কাব (রা.) এর উত্তরসূরি।

NEON Publication
Shop # 316, Books & Computer Complex,
45, Banglabazar, Dhaka-1100
Email- neonpub.bd@gmail.com